# ঘুমভাঙার রাত

প্রবোধকুমার সান্যাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

দেড় টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

# ঘুমভাঙার রাত

## এক

বয়সে আমি বছর তিনেকের ছোট ছিলাম, সেই সুবিধা লইয়া শিবরাণী আমাকে যখন তখন তিরস্কার করিতেন। ছোট বলিয়া আমি যে নিতান্তই ছোট ছিলাম না, মেয়েদের মনের খবর জানিবার বয়স যে আমার হইয়াছিল, আমি যে রীতিমতো গল্পের নায়িকা হইয়া উঠিয়া আমার সাবালিকাত্বকে প্রমাণ করিতে পারি ইহার দিকে শিবরাণী ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, করিবার সুযোগও হইত না, তাঁহার রুচিও ছিল না। ছোট বলিয়া তিনি আমাকে অনুকম্পা করিতেন, তাঁহার কাজের প্রতিবাদ করিলে তিনি হাসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া আমাকে ঠাণ্ডা করিতেন। ভাবিতাম, চুলায় যাক্, কলেজে-পড়া মেয়েরা ভুল করিতেই ভালোবাসে— আমি দিব্য তাঁহার স্নেহের প্রশ্রয়ে অন্ন বস্ত্র লুণ্ঠন করিয়া আমার বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিয়া যাই।

আমি গ্রামের মেয়ে। আমার ব্যবহারের গ্রাম্যতা লইয়া শিবরাণী অনেক পরিহাস করিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি শহরের

মেয়ের চেহারায় শিক্ষার পালিশ না থাকিলে তাহারা প্রায় অনেকেই আমার পর্য্যায়ে পড়িতেন। ইহার কারণ, মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোনও বস্তু আমি বিশ্বাস করি না, তাহারা একই প্রকৃতির বিভিন্ন মূর্তি মাত্র। কিন্তু পুরুষের বেলা ইহা খাটে না, তাহারা প্রত্যেকেই স্রষ্টা, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। অন্তত ইহাই আমি বিশ্বাস করি।

বছর ছয়েক আগে শিবরাণী বাংলার এক সুদূর পল্লীগ্রামে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। আজ যাঁহারা কংগ্রেসের রাষ্ট্রনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই পদধূলি সেদিন সেই গ্রামে পড়িয়াছিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাঁহাদের আগমন-বার্তা প্রচারিত হইবার পর বহু নরনারী তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের চোখেমুখে হুজুগ কৌতূহলটাই বড়, কলিকাতা শহরের চাকচিক্যটাকে গ্রামের পটভূমিতে দেখিবার আগ্রহটাই ছিল প্রধান। মেয়েদের দলে শিবরাণীর প্রতিপত্তিই ছিল বেশি, তাঁহার রাজনীতিক খ্যাতি দৈনিক পত্রিকার মারফৎ গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ও হরিসভায় পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকেও গ্রামের কেহ কেহ অভ্যর্থনা করিল। সেদিন বারোয়ারিতলার বিরাট জনসভার চিত্র আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেদিন সমগ্র গ্রাম যৌবন জল তরঙ্গে প্লাবিত হইয়াছিল।

নেতা ও নেত্রীগণ ছিলেন বড় বড়, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ছোট ছোট। চরকা, খদ্দর, পল্লীসংস্কার, গৃহশিল্প, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি। মাঝখানে শিবরাণী উঠিয়া বক্তৃতা দিলেন। কে যেন

তাঁহাকে জোর করিয়া তুলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ মৃদু, মিষ্ট ও লজ্জাজড়িত। তিনি কথা বলিতে গিয়া মাথা নত করিলেন, চীৎকার করিতে গিয়া মুখ রাঙা করিলেন, এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বস্তুত, কাঁদিলেই তাঁহাকে দেখিতে সুন্দর হয়, তাহার অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর দিকে তাকাইলে দেশমাতৃকার করুণ চক্ষু স্মরণ করাইয়া দেয়। জনসভা সেদিন স্তব্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

সভার শেষে সকলে জানাইলেন, এই গ্রামের যদি কেহ কিছু বলিতে চান্ তবে আমরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাহা শুনিব। যিনি বলিবেন তিনি মঞ্চের উপর উঠিয়া আসুন।

শ্রোতাগণের ভিতরে অনেকেই কানাকানি করিল; গ্রামের যাহারা কর্মী তাহারা পরস্পরের গা ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল; রিসভার বৃদ্ধ সভ্যগণ কানাকানি করিয়া নানা মন্তব্য করিলেন, কিন্তু কেহ কিছু বলিবার জন্য অগ্রসর হইলেন না। সভাপতি ীরবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, অনেকেই অনেকের নাম প্রস্তাব করিলেন কিন্তু সমবেত দেশনেতা ও নেত্রীগণের সম্মুখে লজ্জা ও ভৃষ্টতা কাটাইয়া কেহই বক্তৃতা করিবার সাহস করিল না। হারা দেখিতেই আসিয়াছে, বলিতে নয়।

সভা ভাঙিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ভীড় ঠেলিয়া কটি কিশোরী মেয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল। মেয়েটি এতক্ষণ ক কোণে বসিয়া গোটা দুই জামরুল চিবাইয়া রস টানিতেছিল।

সহসা মুখের জামরুল ফেলিয়া দিয়া তাহাকে অমন করিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া অনেকেই তাহাকে হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ জানাইল, অনেকে তাহার আঁচল টানিয়া ধরিয়া ধমক দিল। কেহ বিদ্রূপ করিয়া সস্নেহে কহিল, পাগ্‌লী ক্ষেপিয়াছে।

সোজা মঞ্চের উপর উঠিয়া মেয়েটি ক্ষণেকের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার স্পর্ধা দেখিয়া সকলেই অভিভূত। তাহার সেই মুহূর্তের হতচকিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বোধ করি তাহার কোনও আত্মীয় ভীড়ের ভিতর হইতে চীৎকার করিল, এ বেলা নেমে আয় ঝুম্‌নি, গাঁয়ের মাথা হেঁট করাস নে।

মেয়েটি চকিতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া অকস্মাৎ বক্তৃতা সুরু করিল। তখনও তাহার চিবুকে চিবানো জামরুলের শাঁ লাগিয়া আছে, কিন্তু তাহার বক্তৃতার বারুদে ততক্ষণে আগু লাগিয়া ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার ভাষা দুরস্ত হয় নাই, কোথায় পূর্ণচ্ছেদ টানিতে হয় তাহাও অজ্ঞাত, বক্তৃতা শুনিয়া কে কি ভাবিতেছে সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু সে চীৎকার করিয়া চলিল। তাহার বক্তব্য কি তাহা সে নিজেও জানে না, কী তার বিষয় বস্তু তাহাও অপরিজ্ঞাত, অথচ সভার শেষে যাহারা য যাই করিতেছিল তাহারাও ফিরিয়া আসিয়া পল্লীগ্রামের ে অত্যাশ্চর্য মেয়েটীর অত্যাশ্চর্য বক্তৃতা শুনিবার জন্য পুনরায় অ গ্রহণ করিল।

দীর্ঘ একঘণ্টা ধরিয়া সে বক্তৃতা করিয়া এক সময় থামি

বসিয়া পড়িল না, নামিয়াও আসিল না, কেবল দেখা গেল অদূরে ভৈরব নদীর তরঙ্গের মতো তাহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। অনেকে মনে করিয়াছিল সে বুঝি কাঁদিতেছে, কিন্তু শিবরাণী মুখ ফিরাইয়া লক্ষ্য করিলেন, যে-আগুন দেশপ্রেমিকের বুকের ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া তাহার সমগ্র জীবন ছারখার করে, ওই মেয়েটির দুই চোখে সেই পুতঃ অগ্নিশিখা অনির্বাণ ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছে! শিবরাণী উঠিয়া আসিয়া সস্নেহে সেই কিশোরীর হাত ধরিলেন, এবং সর্বত্যাগী সভাপতি মহাশয় সমবেত করতালিধ্বনির ভিতরে উঠিয়া নিজের গলার মালা খুলিয়া সেই কিশোরীর কণ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেন।

ছেলেরা জয়ধ্বনি করিল, গ্রামের মাথা হেঁট হইল। হরিসভার বৃদ্ধ সভ্যগণ ঘোর কলিকালের উপর দোষ চাপাইয়া প্রস্থান করিলেন।

আত্মপ্রশংসা করিবার মতো ছেলেমানুষী আমার নাই। শিব-রাণীর সহিত প্রথম পরিচয়ের কথাটাই নিবেদন করিলাম। যুমনি বলিয়া সেদিন যাহাকে গ্রামবাসীরা বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিল তাহার নাম যমুনা। বলা বাহুল্য আমিই সেই যমুনা।

## দুই

অনেক মেয়েকেই আমি দেখিয়াছি কিন্তু শিবরাণীর ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই। বাঙালীর মেয়ের কি কি গুণ আছে তাহা আমি জানি, কিন্তু দোষ যে কতকগুলি আছে তাহা শিবরাণীকে আগে না দেখিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। শিবরাণী রাজনীতি করিতে বসিয়াছেন কিন্তু একথা তিনি জানেন না যে, কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। কপটতা ও অসাধুতা যে রাজনীতির দুইটি প্রধান অঙ্গ ইহা শিবরাণীকে বুঝাইবার মতো মানুষ পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়ত তাঁহার স্নেহশীলতা। যাহারা তাঁহার অনুচর অথবা যাহারা নানা উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার নিকট আসে তাহাদের প্রতি অহেতুক স্নেহে তিনি বিগলিত হইয়া যান্। ইহাতে অনেক সময় আমি বিরক্তিবোধ করিয়াছি। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনও সভা-সমিতিতে হয় ত তাঁহাকে যাইতে হইবে, এমন সময় শোনা গেল, অমুক স্বেচ্ছাসেবকটি পীড়িত—অমনি শিবরাণী ছুটিলেন। ইহাতে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে, অনেক লাঞ্ছনাও সহিয়াছি, কিন্তু শিব-রাণীকে সংস্কৃত করিয়া তুলিবার মানুষ পাওয়া যায় নাই।

আজ সকালে তাঁহার ফিরিতে প্রায় বেলা বারোটা হইল। দেরি দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ হইতে হয় ত তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাঁহার বৃদ্ধ মাতুলও উদ্বিগ্ন

হইয়া বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন—এমন সময় ছাতা মাথায় তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম। উপরে উঠিয়া আসিলে বলিলাম, তোমাকে যে নতুন মনে হচ্ছে রাণীদি।

ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?—বলিয়া শিবরাণী ঘরে ঢুকিয়া জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিলেন।

তোমাকে ঠাট্টা করতে পারি? বাবা রে, কেঁদে তুমি এখুনি আমাকে পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কবে আবার আমি ঠাট্টা শুনে কাঁদলুম রে, যমুনা?

কাঁদো নি ত, চোখের জল ফেলেছ।

কবে?

কাল গভীর রাত্রে—মানে, যখন নবেন্দুবাবুর কথা বলছিলুম। —আমি বলিলাম।

শিবরাণী বলিলেন, বেচারা! ওকে তুই সইতে পারিস্ নে, আমি জানি। আচ্ছা, আমি কী অন্যায় করেছিলুম ভাই, বাস ভাড়া ছিল না তাই তাকে দুআনা পয়সা সেদিন দিয়েছিলুম—

বলিলাম, সে হেঁটে গেলে তোমার কী ক্ষতি হোতো? দেশের কাজ কি কেবল তোমারই কাজ?

ওমা, কি বলিস ভাই? আমরা না হয় মেয়েমানুষ, পথের কষ্ট সইতে পারি—ওরা যে ছেলে, পারবে কেন?—এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নীচ হইতে খাইবার ডাক পড়িতেছিল।

খাইতে বসিয়া বলিলাম, আমি তোমার এখানে থাকবো না, রাণীদি।

কেন রে?

তুমি আমার একটা কাজ জুটিয়ে দিলে না, আর কতদিন ব'সে থাকবো?

তুই গেলে আমার চল্‌বে কেমন ক'রে ভাই?

বলিলাম, তোমার তাঁবেদারি করবার জন্যে ত আমার জীবন নয়। আমার ভবিষ্যৎ আছে।

তোর ভবিষ্যৎ। তবে গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিলি কি জন্যে?

বলিলাম, নেশা কেটে গেছে!

তিনি বলিলেন, দেশ উদ্ধারের সখ মিট্‌লো?

ছিল কি কোনোদিন? পালিয়ে এসেছিলুম দেশের স্বাধীনতা আহরণের জন্যে নয়, নিজের স্বাধীনতা পাবো ব'লে।

পেয়েছিস?

একটু বাকি আছে।

সেটুকু কি?

হাসিয়া বলিলাম, নবেন্দুবাবুরা জানেন।

তোর কেবল ঠাট্টা।—বলিয়া শিবরাণী মুখখানি ম্লান করিলেন। বলিলেন, দেখিস ভাই, বাইরে যেন এসব কথা উচ্চারণ করিস নে। তিনি—আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তা হলে লোকে নিন্দে করবে, ছি।

## ঘুমভাঙার রাত

আমাদের কাছাকাছি কেহ ছিল না। ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে গিয়া আমরা এমনই অনিয়মে আহার, বিহার, নিদ্রা ইত্যাদি সমাপন করিতাম যে কেহই আমাদের সহিত পাল্লা দিয়া উঠিতে পারিত না, সকলেই আমাদের সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। বাড়ীতে শিবরাণীর আত্মীয় স্বজন সকলে থাকা সত্ত্বেও আমরা কেমন যেন অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেশের কাজ করিতে নামিলে আত্মীয়গণও পর হইয়া যায়—এই মনে করিয়া আমরা মনে মনে সান্ত্বনা পাইতাম এবং খুব একটা উঁচু স্তরে দাঁড়াইয়া সকলকে মার্জনা করিয়া চলিতাম।

হাসিয়া বলিলাম, সেদিন নবেন্দুবাবু যা করছিলেন—

শিবরাণী কহিলেন, কি করছিলেন?—বল ভাই, লক্ষ্মিটি—এই নে, এই মাছখানা তুই খা যমুনা—বলিয়া বড় মাছখানা তিনি আমার পাতে তুলিয়া দিলেন। পুনরায় কহিলেন, আঃ আজ খাদি-ভাণ্ডারে যা চমৎকার ছিট্ দেখে এলাম, ব্লাউস হবে অতি সুন্দর—তোর ত একটিও জামা নেই যমুনা?

বলিলাম, কোত্থেকে থাকবে? তুমি ত সব বিলিয়ে দাও।

তিনি বলিলেন, দেবার সময় আমি ভাই দেখতেই পাই নে কোন্‌টা কার! আমি তোর চারটে ব্লাউস ক'রে দেবো। আর কি নিবি বল্, রূপোর কানবালা, মাকড়সা ফ্যাশনের?—হ্যাঁ, নবেন্দুবাবু কি করছিলেন রে?

বিশেষ কিছুই নয়, তবে কিনা—

তিনি উৎসুক হইয়া আমার দিকে চাহিলেন।

গলার আওয়াজের ভিতরে আমার কোনও চাতুরী ছিল না, এবং আমার চোখে মুখে ছিল নির্লিপ্ত সরলতা। তাঁহার অধীর আগ্রহকে লইয়া পরিহাস করিতেও পারিতাম, কিন্তু মানুষের দুর্বলতা লইয়া খেলা করা আমার পছন্দ নয়। বলিলাম, এখানে বল্‌ব না, ওঘরে তোমার বৌদিদি আছে, শুনতে পাবেন।

শিবরাণী তাড়াতাড়ি বলিলেন, আমার এখন আর কোনো কাজ নেই, চল্ আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করি গে। তোকে আজ এমন একটা মজার কথা বল্‌ব।

আমার ঔৎসুক্য কম। কারণ পৃথিবীর কোনও মজার প্রতিই আমার আকর্ষণ নাই। মেয়েলি কৌতূহল অবশ্যই আমার আছে, তাহার কারণ প্রথমত আমি স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়ত আমি বয়সে প্রবীণ হইয়াছি অর্থাৎ সেদিন কুড়ি পার হইয়াছে। ইহার পরে যে-মজাটি আছে তাহা প্রকাশ করিয়া আর 'বেহায়া' নাম লইতে ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া ওদিকটা শিবরাণীদের মানায়, আমি গরীবের মেয়ে, গ্রামের মেয়ে, চিত্তবিলাস আমাকে সাজে না।

পুতুল দিয়া ভুলাইয়া ছোট ছেলের মুখ হইতে লোকে যেমন করিয়া কথা আদায় করিতে চাহে তেমনি ভাবে আমাকে আদর করিয়া হাত ধরিয়া শিবরাণী উপরে উঠিতেছিলেন। আমাদের ঘর তেতালায়, সেইখানেই আমাদের রাজত্ব। ইনি ধনাঢ্যের মেয়ে, বাবা পুরাতন জমীদার এবং পেন্সনভোগী, দুইটি মেয়ে ছাড়া আর

কেহ নাই। শিবরাণী মামার বাড়ীতে থাকিয়া দেশ-সেবা করেন, পিতার নিকট হইতে মাসোহারা আসে। রাজনীতি করিতে করিতেই শিবরাণী বি-এ পাশ করিয়াছেন, এবং দেশসেবার অবিশ্রান্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার বিবাহ করিবার অবকাশ পাওয়া যায় নাই।

সিঁড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিতেছিলাম, নিচে ডাক পড়িল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, বছর আঠারো বয়সের একটি ছেলে হাত তুলিয়া নিচে হইতে আমাদের নমস্কার জানাইল। অগত্যা দুইজনেই নিচে নামিয়া আসিলাম।

ছেলেটি বজবজ হইতে আসিতেছে, আমরা তাহাকে চিনি। পায়ে এক পা ধূলা, গায়ে একটি ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী, এই সেদিন সে জেল-হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, বাহিরে আসিলে দেখা গেল একটা পা সে খোঁড়াইয়া হাঁটে। তা হাঁটুক, কাজ করিতে গেলে শারীরিক লোক্সান সইতে হয় বৈ কি। শিবরাণীর দিকে ফিরিয়া সে কহিল, ছাত্রসভা এই ফুলের তোড়া আপনাকে পাঠিয়েছে, আপনার কালকের বক্তৃতায় আমরা সকলে মুগ্ধ হয়েছি। আগামী কাল বেলা পাঁচটায় ময়দানে আমাদের সভা, আপনি অনুগ্রহ করে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করবেন।

আমি বলিলাম, সে সভার উদ্দেশ্য?

ছেলেটী বলিল, স্বেচ্ছাসেবকের আদর্শ কি হওয়া উচিত সেই আলোচনা হবে। ধরুণ, দেশের বর্তমান অবস্থায়—এই বলিয়া সে অনেক কথা বলিয়া চলিল।

আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করিলাম ছেলেটির কথার দিকে শিবরাণীর ভ্রূক্ষেপ নাই, বরং তাহার খোঁড়া পায়ের দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। ইহাই শিবরাণীর প্রকৃতি, তাঁহার ভিতরে কোথায় একজন পুরাকালের প্রাচীন স্ত্রীলোক বাস করে, স্নেহে সে অন্ধ, করুণায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য—বর্তমানকালের আলোক ও সংস্কৃতি তাহার মনের অন্ধকুঠুরীতে আজিও পৌছায় নাই। ছেলেটি কথাবার্তা থামাইলে শিবরাণী প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি হেঁটে আসছো বজবজ থেকে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কখন্ বেরিয়েছ ?

সকালে। না না, হেঁটে আসতে কোনো কষ্ট হয় নি। রাস্তায় আমি মুড়ি খেয়েছি। দেশি বিস্কুট আর কি।—বলিয়া ছেলেটি হাসিতে লাগিল।

শিবরাণী প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছেন ?

ছেলেটি ঢোঁক গিলিল। প্রথমটা সে বলিতে চাহিল না কিন্তু অনুরোধটা এড়াইয়া গেলে অশোভন হইবে মনে করিয়া সে নতমস্তকে বলিল, মা আছেন কিন্তু তাঁর একটু মাথার দোষ হয়েছে এই কিছুদিন থেকে—

কোনো অসুখ ছিল বুঝি ?

আজ্ঞে না, দাদারা কাছে নেই কিনা—

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় তাঁরা—

ছেলেটি আমাদের এই অহেতুক কৌতূহল দেখিয়া মুখ [illegible] তারপর করুণ হাসিমুখে কহিল, বড়দা আটক আছেন বহরমপুর জেলে, আর মেজদা—তিনি পলাতক, একটা ট্রেণ-ডাকাতির মামলায় তিনি নাকি জড়িত। বাড়ীতে আর আছেন আমার বড়বৌদি, তাঁর আবার টি-বির লক্ষণ। আচ্ছা, আমি এইবার যাই।

আমার গ্রাম্য কৌতূহল পুনরায় জাগ্রত হইল, প্রশ্ন করিলাম, কেমন ক'রে তোমাদের চলে ?

ছেলেটি বলিল, বড়দার দরুণ বৌদিদির মাসোহারার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেছি। বোধহয় আসছে বছর থেকে পাবো। আচ্ছা, নমস্কার।—বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না, আমাদের স্নেহাকর্ষণের ভয়ে হন্ হন্ করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, নিলে না কিছু, চ'লে গেল।

স্তব্ধ পাষাণ পুত্তলীর ন্যায় শিবরাণী দাঁড়াইয়াছিলেন এতক্ষণ, কিন্তু শেফালি ফুলের গাছে সামান্য নাড়া দিলে যেমন ঝর ঝর করিয়া ফুল ঝরিয়া পড়ে, তেমনি আমার সামান্য কথায় এইবার তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই অশ্রু আমি ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পাইবে না জানি, তবু শিবরাণীর পদপ্রান্তে বসিয়া সাধনা করিয়া আমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম, আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, যে-অশ্রু আজ আমার হাতে ঝরিয়া পড়িল, তাহাতে দেশ-মাতৃকার বুকের রক্ত মিশানো।

## তিন

শিবরাণীর সহিত এক বিষয়ে আমার মতভেদ ছিল। তিনি বাঙালী মেয়ের চিত্তোন্নতির উপরে আস্থা স্থাপন করিতেন। তিনি বলিতেন ইহাদের প্রকৃতির ভিতরে বারুদ আছে।

আমি বলিতাম, বারুদ নয়, ছাই।

তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, আগুন ধরাবার মানুষ নেই, থাকলে ওই ছাই বারুদ হয়ে জ্বল্‌ত।

উত্তর দিতাম, ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেই এমন দৈন্য নেই, মহিলা নেত্রীর অভাব কেবল বাঙলায়। একজনও দেখাতে পারো যিনি মৌলিক চিন্তা করেন? যাঁর স্বাধীন মন? নেই।

আমার মুখখানা তিনি গলার ভিতরে টানিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তিনি যে লোকনিন্দার ভয়ে এই সব আলোচনা করিতে চান্ না তাহা নহে, আমার দিব্য দৃষ্টির গুণে জানিলাম, নিজের মনোবিকলনের আশঙ্কায় এই সকল আলাপকে তিনি অগ্রসর হইতে দিতে রাজি নন্। তাঁহার এই সর্বনাশা দুর্বলতা অনুভব করিলে আমি ভয় পাইতাম।

সকালবেলা স্বেচ্ছাসেবিকা ও চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। আমাদের এই বিড়ম্বনার ইতিহাস বলিয়া এই কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করিব না। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পথে আমাদের আসিতে দেখিলে আশপাশের গৃহস্থরা বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন। চাঁদা যে দুই চারি আনা পাইতাম না তাহা

নহে কিন্তু আমাদের প্রভাবে পড়িয়া বাড়ীর মেয়েরা যে স্বদেশী হুজুগে মাতিয়া উঠিবে ইহা কোনও বুদ্ধিমান পিতামাতা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমরাও পারিতাম না। ইহার পিছনে যে হুজুগ নাই, কর্মপ্রেরণা আছে, ইহা যে কেবলমাত্র কর্ম নহে, ধর্মও বটে—এই সোজা কথাগুলি বুঝাইতে শিবরাণী জীবনপাত করিতেন। সংবাদপত্রে বড় বড় হরপে আমাদের নাম ছাপা হয় বটে কিন্তু সামাজিক জীবনে আমাদের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না! কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করিলে কাজের আগে আমাদের নানারূপ অসুবিধাজনক প্রশ্নের জবাবদিহি করিতে হইত। আমাদের মা-বাপ আছে কিনা, আমরা ভদ্র গৃহস্থকন্যা কিনা অর্থাৎ ভদ্রঘরের সাধারণ মেয়েরা 'স্বদেশী' করিয়া বেড়ায় না—আমাদের বিবাহ হয় নাই কি কারণে, এত লোক থাকিতে আমরাই বা দেশ উদ্ধার করিতে ছুটিলাম কেন, কাঁচা টাকাপয়সা তুলিয়া আমরা কি ভাবে খরচ করি—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের নাস্তানাবুদ করিয়া চোখের জল ফেলাইয়া তবে কেহ কেহ চার আনা আট আনা বাহির করিয়া দিতেন।

আজও এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে ইহারই পুনর্বৃত্তি ঘটিবে এই আশঙ্কা করিতে ছিলাম, কিন্তু শিবরাণীর লাঞ্ছনা সহিয়া গেছে। তিনি আমার হাতে টিপ দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ভিতরে গৃহস্থ সুলভ সমস্ত উপকরণই আছে। ঝি, চাকর, বামুন আছে,

সংসারযাত্রার ব্যয়বহুল সমারোহ আছে, আসবাব ও সাজসজ্জার অতিশয় আড়ম্বর আছে। কিন্তু দেশের কাজে যৎসামান্য কিছু দান করিতে অনুরোধ করার যে স্পর্ধা ও অপরাধ, সেই অপরাধে আমাদের পদক্ষেপ কুণ্ঠাজড়িত, আমরা সভয় সন্তর্পণে অগ্রসর হইলাম। চুরি করিতে আসি নাই সত্য, প্রবঞ্চনা করিয়া পলাইবার চেষ্টাতেও আসি নাই, তবু মনে হইল, স্বার্থটা যেন আমাদেরই, ভদ্র মেয়ের বেশ ধরিয়া আমরা যেন উদরান্ন সংস্থানের জন্য মুষ্টিভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, যদি অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয় তবে আমাদের বলিবার কিছু থাকিবে না।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যাইতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, চাঁদা চাই, কেমন? কই, কাজ ত কিছু হয় না দেখি। বড় বড় নেতারা দেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়াবেন, তাঁদের রেলভাড়া আর রাহাখরচ কতকাল যুগিয়ে যাবো বলুন দেখি? যান্, ওদিকে ওঁরা আছেন— বলিয়া তিনি নিজে অন্যপথে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণীর দেখা পাইলাম। অতিশয় ভোজন ও সম্ভোগে তাঁহার চেহারার চাকচিক্য একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছে। স্বাধীনতা কামনায় আমাদের অন্তরে ঝড় বহিতেছে একথা মিথ্যা নয় কিন্তু এই চিকন নধর মাংসপিণ্ডের দিকে চাহিয়া আমি মনে মনে নিজেদের দেশসেবার নির্বুদ্ধিতার কথা আর একবার স্মরণ করিলাম। বয়স পঁয়ত্রিশ হইবে, পরিধানে কেবলমাত্র একখানা ফরাসডাঙ্গার

কালাপাড় শাড়ী, সেমিজ নাই—গলায় সাতলহরী চেন্, হাতের তাগা মাংসের সহিত আঁটিয়া বসা, দুই হাতে দুই গোছা ভাটিয়া চুড়ি, মুখখানা তাম্বুলরঞ্জিত। আমাদের দেখিয়া তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, সেদিন ফিরে গিয়েছিলে তোমরাই না? বসো।

আসন আমরা চাই না, বসিতে বলিয়াছেন এই খুব। আমরা কৃতার্থ হইয়া মেঝের উপরেই বসিলাম। আমাদের চিনিতে তিনি ঠিকই পারিয়াছেন, তবে পরিচিত লোককে ঠিক চিনিতে পারিতেছি না—এই কথা বলিলে নাকি আত্মাভিমানীরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, ইহা আমরা জানিতাম।

শিবরাণীর কানে কানে বলিলাম, তিন মণ চর্বি!

তিনি আমার আঙুল টিপিয়া থামাইলেন। আমি পুনরায় বলিলাম, যদি আর এক বছরের মধ্যে স্বরাজ না পাই তবে এক মাড়োয়ারি গদীওয়ালাকে বিয়ে করবো। পঞ্চাশ ভরির এক জোড়া তাগা—এ আমার চাই। চলো রাণীদি এখান থেকে, চাই নে চাঁদা। দেশ চুলোয় যাক।

চুপ চুপ, রাগ করতে নেই যমুনা।

রাগ করি সাধে? দেখলে না ওর টলচলে হাঁটুনি? তবু যদি চর্বি ছাড়া আর কিছু থাকতো ওই দেহে!

শিবরাণী হাসিমুখে বলিলেন, শুনতে পাবে, চুপ চুপ।

এইবার গৃহিণী আসিলেন। কিন্তু তিনি একা নন, সঙ্গে আর একটি বউ। গৃহিণী বলিলেন, এটি আমার সতীন পো-বৌ। নতুন



২

বিয়ে হয়েছে। গয়না অনেক তোলা আছে, সব ত আর প'রে থাকা যায় না, ভারি-ভারি। জিনিসপত্র বেহাই অনেক দিয়েছেন, দুটো ঘর ঠাসাঠাসি। বৌমা, এরা এসেছে চাঁদা চাইতে, একটা টাকা বের ক'রে দাও ত মা? ওর কম কি ওরা শুনবে?

বৌমা কলের পুতুলের ন্যায় ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। আমরা বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের গহনা দেখিলাম, অহঙ্কার লক্ষ্য করিলাম, বাঙালী মেয়ের চিত্তদারিদ্র্যের কারণ আবিষ্কার করিলাম। সোনার খাঁচায় সুখে থাকিতে এমন জীব আর ভূ-ভারতে নাই। ইহারা এত আরামে আছে যে, দেশের দুঃখ দুর্দশার কথা বলিয়া হাস্যাস্পদ্ হওয়া চলে না।

গৃহিণী বলিলেন, চাঁদাটা কিসের জন্যে নিচ্ছ?

বলিলাম, কংগ্রেস ফণ্ডে যাবে।

তিনি বলিলেন, তোমাদের এতে কি লাভ?

শিবরাণী বলিলেন, আমাদের ওপর এই কাজের ভার আছে। চাঁদা আমাদেরও দিতে হয়।

গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপরে বলিলেন, সেবার খদ্দরের শাড়ী একখানা [illegible], সর্বনেশে কাপড়! কোমর কেটে রক্তারক্তি। রক্ষে করো, প্রাণ বাঁচলে তবে দেশ।

বলিলাম, আমরাও ত পরি!

তোমরা পারো না। পাঁচ বাড়ী ভিক্ষে ক'রে বেড়াও, সেটা সয়, আর খদ্দরের শাড়ী সইবে না?

আমরা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। ইহার উত্তর দিলে এবাড়ীতে আর আসা চলিবে না, অথচ এ বাড়ীও ত দেশের অন্তর্গত, ইহাকে ত্যাগ করিব কেমন করিয়া? কিন্তু ইহাদের নিকট অপমান সহ্য করিয়া ইহাদেরই কাজ করিব, এই আমাদের কেবল সান্ত্বনা!

বৌমা একটি টাকা আনিয়া আমাদের কাছে রাখিল। আড়ষ্ট হাতে টাকাটি তুলিয়া লইয়া কোনোমতে একটা নমস্কার সারিয়া বিদায় লইলাম।

শেষের কথাটায় যে অপমানের আঘাত ছিল, পথে আসিয়াও সেটা বুকের ভিতরে রি রি করিতে লাগিল। সেদিন একজন বিশিষ্ট নেতা আমাদের ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, ভিক্ষে চেয়ো না, ধমক দিয়ে আদায় করবে! শাসনে আর বন্ধনে ওদের মনুষ্যত্ব নেই। বাইরে ওরা অসম্মানিত উৎপীড়িত, ওরা তার প্রতিশোধ নেয় তাদের ওপর, যারা ওদের করুণার প্রত্যাশা করে। বাহিরে মার খায়, তার শোধ তোলে মেয়েদের ওপর। তাই ত মেয়েদের এত দুর্গতি।

কিন্তু বিবাদ করবো সকলের সঙ্গে?

বিবাদ ত নয়, মা যেমন শাসন করে নির্বোধ সন্তানদের।

কথাটা সেদিন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই তাহার কারণ, ইহারা আদর্শবাদী নেতা, কর্মী জীবনের শত সহস্র লাঞ্ছনার সহিত ইহাদের পরিচয় নাই। আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, দেশবাসীর কাছে আত্মসম্ভ্রম যদি নির্মমভাবে পদদলিত হয়, যদি কোথাও কোনও সম্মান ও শ্রদ্ধা দাবি করিতে না পারি, তবে

মনুষ্যত্ব বিকাইয়া নিজের কাছেও ত ছোট হইয়া যাইব! সেই অধঃপথের সান্ত্বনা কি দেশপ্রীতির ভিতরে পাওয়া যায়?

অনেক কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিলাম, এক সময়ে শিবরাণী এক বাড়ীর দরজায় থামিলেন। বলিলাম, আর কেন রাণীদি, ক্ষিদে তেষ্টা কি আমাদের থাকতে নেই? ফিরে চলো আজ চারটের সময় সভা, মনে নেই?

শিবরাণী বলিলেন, গৌরীকে একবার দেখে যাই। ওকেও ত সভায় যেতে হবে। কাগজে ওর নাম দেখলুম।

বলিলাম, সে হয় ত মেয়ে জোগাড় করতে বেরিয়েছে।

আয় দেখি।

ফিরিয়া গেলেই যে ভালো হইত ইহা শিবরাণীর একবারও মনে হইল না। অপমান তখনও আমাদের বাকি ছিল, এবং সে অপমান যে কত বড় তাহা এমন করিয়া আগে বুঝি নাই।

বাড়ীর দুইটা দরজা। উপরের বারান্দার নিচে দিয়া যে-পথটি সটান অন্দরমহলে চলিয়া গেছে, সেই পথে আমরা প্রবেশ করিলাম। উপর হইতে সম্ভবত কেহ আমাদের লক্ষ্য করিয়াছিল, সহসা ভিতরে একটা কোলাহল শুনিয়া আমরা একটু থমকিয়া গেলাম। কোলাহলটা যে আমাদের উদ্দেশ করিয়া ইহা তখনই বুঝিতে দেরি হইল না।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিব, এমন সময় এক প্রৌঢ়া বিধবা নিচে নামিয়া আসিলেন। আমরা নমস্কার করিয়া বলিলাম, গৌরী কি বাড়ীতে নেই?

তিনি বলিলেন, গৌরীকে না হ'লে তোমাদের এই ব্যবসা বুঝি ভালো জমে না?

আমরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, ভালো, ভালো, খুব ভালো। বিয়ে থায় খরচও নেই, ঝঞ্চটও নেই—কিন্তু এটা যে ভদ্দল্লোকের বাড়ী, সেটা কি ভুলে গেছ তোমরা?

বলিলাম, কি বলছেন আপনি?

বলছি যে, প্রজাপতির কারখানা খুলেছ কতদিন? পুরুষ-মানুষ তোমাদের চটকে ভুলতে পারে কিন্তু আমাদের চোখে এত বড় ফাঁকি? দেশের কাজ, কেমন? দু'রাত মেয়ে আমার বাড়ী ফিরলো না, সেটাও বোধ হয় দেশের কাজ? কোথায় আড্ডা তোমাদের বাছা? সেখানে ট্রকালিতে তোমরা কত পাও?

শিবরাণী বলিলেন, গৌরী কি দু'দিন বাড়ী আসে নি?

বিধবা বলিলেন, যেন তোমরা কিছু জানো না! কোত্থেকে জান্‌বে? দেশের কাজে নেমে ভারি সুবিধে হয়েছে ত তোমাদের? নামাবলীর আড়ালে মাছ মাংস চালাচ্ছ, সাত দেশের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে এসে চান্‌ ক'রেই শুদ্ধু, কেমন? বেশ, করো, করো। উপোসী ছারপোকা তোমরা লুকিয়েছিলে, এখন আর ভাবনা কি। কেন রাখবে জাত ধর্ম, কেনই বা মানবে লজ্জা সরম? বেশ, খুব ভালো, প্রাণ ভ'রে স্বদেশী করো, বোকার দল বাহবা দেবে।

## ঘুমভাঙার রাত

আমরা পাথরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও আমাদের ছলনা মনে করিয়া তিনি মাত্রা আরও চড়াইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। যেমন উপমা, তেমনি শব্দাড়ম্বর, অপূর্ব ভাষা রচনার কৌশল, সুন্দর বচনভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর। শিবরাণী মুগ্ধ হইয়া স্তব্ধ নতমুখে এই ব্রজবুলি শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখাবয়বের রূপ প্রথম রক্তাভ হইতে ফিকা বেগুনি, এবং তৎপরে এখন ঘোর নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি পল্লীবালা, সেখানকার শিরোমণি তর্করত্ন মহাশয়গণের চরিত্র সমালোচনার মাপকাঠির সহিত আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল, আমার কালো মুখ কুরূপ হইয়াই রহিল। আমার নির্লিপ্তমুখে একটিও কুঞ্চন রেখা না দেখিয়া বিধবা আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, লজ্জা তোমাদের কে দেবে মা, আমি ত সামান্য। দোহাই, ব্যবসাটা আমার মেয়ের ওপর চালিয়ো না, টাকার যদি দরকার হয় চেয়ে নিয়ে যেয়ো। বেশি যদি উৎপাত করো, মেয়েচুরির ব্যবসা ধরিয়ে দেবো, আজও ইংরেজ রাজত্ব গোল্লায় যায় নি, মনে রেখো!—এই বলিয়া তিনি দুম দুম করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমাদের পা কাঁপিতেছিল, আমরা যেন দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলাম।

কোন্ পথ দিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছি তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া একদিকে পা বাড়াইলাম। চোখের জলে শিবরাণীর চক্ষু অন্ধ হইয়া গেছে, আমি তাঁহার হাত ধরিলাম। বলিলাম,

লাভ একটু হোলো বৈ কি রাণীদি, অন্তত একটা ব্যবসার খোঁজ পাওয়া গেল। এসো, এইদিক দিয়ে যাই।

কয়েক পা মাত্র বাড়াইয়াছি, এমন সময় পাশের একখানা তালা লাগানো ঘরের জানালা দিয়া একখানা হাত বাহির হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, গৌরী জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়াছে। আমাদের দেখিয়া বলিল, অপমান মেনে নিয়ো না যমুনাদি, এই আমাদের পুরস্কার! ভাঙবো, ভাঙবো সব, কতদিন বাধা দেবে!

চুপি চুপি বলিলাম, তোমাকে তালা বন্ধ করেছে কেন ভাই?

গৌরী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, ওরা ভয় পায়, ওরা শান্তিবাদী। দাও তোমার হাতখানা, বাইরের পৃথিবীর ছোঁয়া পাবো আমি।

শিবরাণী তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি জানালার গরাদে রাখিলেন, ভিতর হইতে গৌরীও তাহার করুণ কম্পিত মুখ শিবরাণীর মুখে ছোঁয়াইল। আমি সেই দৃশ্য দেখিলাম, দেখিলাম ভিতর ও বাহিরে কোনো পার্থক্য নাই। একটিমাত্র মুহূর্ত, সেই মুহূর্তে শিবরাণীর নিকট হইতে ধারকরা দৃষ্টি লইয়া গৌরীর ঘরের ভিতরটা একবার দেখিয়া লইলাম। মনে হইল, উহারই ভিতরে যেন আমাদের সোনার ভারতবর্ষ, ওই অন্ধকারে আর অভিশাপে অবরুদ্ধ হইয়া সে দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া আছে। আর গৌরী। গৌরী তাহার আত্মার মানবী মূর্তি!

মুহূর্তমাত্র, তাহার পরেই আমরা দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে আলো পাইলাম, বাতাস পাইলাম, মানুষ পাইলাম, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, কোন্ এক প্রেতিনীর ছায়ামূর্তি আমাদের পিছু লইয়াছে। আমরা হন্ হন্ করিয়া চলিলাম।

## চার

শিবরাণীরা দেশের কাজ করিতেন, আমি শিবরাণীদের কাজ করিতাম। মেয়েদের জগৎটা আলাদা, সেখানে ছেলেদের প্রবেশাধিকার দিলে মেয়েরা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; পুরুষের উপস্থিতি ঘটিলেই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। আমরা কাজ করিতাম বটে, কাজের নীতি ও শৃঙ্খলা আমাদের ভিতরেও ছিল, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকিত পুরুষ-গঠিত শৃঙ্খলা ও নীতির আদর্শের দিকে। সেই জন্য ছেলেদের অবসাদ ও কর্মহীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া পড়িতাম। তাহাদের কর্মপদ্ধতিকে ডিঙাইয়া নূতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিবার মতো মস্তিষ্ক আমাদের ছিল না। কিন্তু মৌলিকতা নাই বলিয়া শিবরাণীদের লজ্জিত হইতে দেখিয়াছি এমন মনে পড়ে না। তাহার কারণ, যদিচ আমরা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, যদিচ চিন্তাধারার দিক হইতে নূতন পথ আমরা কাটিতে পারি নাই কিন্তু মূলত আমরা পুরুষের পথ-চাওয়া জীব, আমরা তাহাদের অনুকারিণী, এবং সত্য বলিতে কি, ছেলেরা যতই আমাদের মাথায় করিয়া নাচুক, আমরাই মনে মনে চিরদিন তাহাদের মাথায় করিয়া ঘুরিয়া মরি। এইটিই মেয়েদের জ্বালা, এবং ইহারই জন্য স্বাধীন আমরা হইলেও মুক্তি

আমাদের কোনোদিন নাই। দিব্যদৃষ্টিতে আমি দেখিতে পাই, ছেলেদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া আমরা ক্লান্ত, তাহাদের খুশি না করিতে পারিলে আমাদের জীবন ব্যর্থ, তাহাদের হাতের পুত্তলিকা হইতে না পারিলে আমরা কেমন একটা শূন্যময়তা অনুভব করি। ছেলেরা যখন বলে, তোমরা স্বাধীন হও, তোমরা আমাদের অন্তরে শক্তিসঞ্চার করো, তোমরা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াও।—আমি তখন হাসিয়া ফেলি। স্বাধীন হইতে পারি কিন্তু তোমাদের পিছনে না থাকিলে আমাদের সুখ নাই; শক্তি সঞ্চার অবশ্যই করিতে পারি—অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত পারি, কিন্তু আমাদের সব শক্তিই যে তোমাদের নিকট ধার করা! একথা তোমরা ভুলিয়া যাও কেন যে, তোমাদের পাঁজর হইতেই আমাদের জন্ম! তোমাদের প্রাণশক্তি আছে বলিয়াই ত আমরা সচল, তোমরা না থাকিলে আমরা যে জড়পিণ্ড হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। আমাদের দলের দেবীদিদি বলেন যে, আমাদের না হইলে ছেলেরা অক্লেশে চিরদিন অনায়াসে চালাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের না হইলে আমরা একদণ্ডও চালাইতে পারি না। আমি শক্ত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিতাম, বলিতাম, দেবীদিদি, তাহারা আসিল কোথা হইতে? তাহারা পৃথিবীর আলো দেখিল কাহাদের কৃপায়?

দেবীদিদি সেদিন চলিয়া যাইবার সময় হাসিয়া বলিলেন, তাহাদের নিজেদেরই কৃপায়!

আমরা কয়েকজন কুমারী মেয়ে এইরূপ মানসিক পরাধীনতা

সহ্য করিতে পারিতাম না। রাগ করিয়া বলিতাম, কৃপাটা কি পারস্পরিক নয়?

মিসেস রায় বলিতেন, একপক্ষের কৃপা, অন্যপক্ষের দয়া ভিক্ষা।

আমরা কি দয়া ভিক্ষা করি? তবে ওরা কেন ছুটোছুটি করে আমাদের পাছে পাছে?

ওরা ছোটে কাজের তাড়ায়। ওরে বোকা মেয়ে, আমরাই ছুটি যে ওদের পিছনে পিছনে। হাতে বালা দিয়ে ছুটি, খোঁপায় ফুল গুঁজে ছুটি, পরিপাটি প্রসাধন ক'রে ছুটি—আমরা যে ছুটি প্রাণের তাড়ায়।

কেন ছুটি?

বাঁধবো ব'লে, বাঁধা পড়বো ব'লে। ওরা যে কর্মী, ওরা যে বৈরাগী, ওরা ঘর গ'ড়ে ঘর ভাঙবারই জন্যে—আমরা ছুটতে ছুটতে ওদের পায়ে প'ড়ে কেঁদে বলি, ঘর দাও, আনন্দ দাও।

নতমস্তকে উত্তপ্ত হইয়া বলিতাম, তবে আর এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নামা কেন? ঘরে গিয়ে উঠি?

তাই ত উঠবো গিয়ে! তবে তার আগে সেই ঘর নিরাপদ করার জন্যই ত এই যুদ্ধ! পুরুষের নিরানন্দ ঘোচাবার জন্য, ঘরের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, পুরুষকে বিজয়ী বীর ক'রে তোলার জন্য আমরা নেমেছি তাদের এই সংগ্রামে! এতে আমাদের নিজস্ব কোনো লাভ নেই, কিন্তু তাদের লাভ হবে ভবিষ্যতে, এতেই আমাদের সুখ। তাদের সফলতাতেই যে আমাদের স্বস্তি, তাদের

অশান্ত উদ্বেগ আর বন্ধনের উৎপীড়ন—এই জন্যেই ত আমাদের প্রাণ ভ'রে উঠেছে শঙ্কায়—এর থেকে নিষ্কৃতি চাই, নৈলে অসন্তুষ্ট পুরুষকে নিয়ে আমাদের স্বস্তি নেই। ঘরের মধ্যে ব'সে তাদের হারাতে পারবো না, বরং বাইরে এসে হাত ধ'রে তাদের বিপদের মধ্যে নামিয়ে দেবো, সেই শক্তির পরিচয় দিতেই আমরা নেমেছি।

বলিলাম, আপনি কি তবে বলতে চান আমরা স্বাধীনতা চাই নে?

মিসেস রায় সস্নেহে হাসিমুখে বলিতেন, বড় হ বুঝবি—আমরা স্বাধীনতা চাই? ওরে, আমরা যে চাই স্বস্তি। আমরা বলি সুখের ঘর দাও, স্বস্তির জীবন দাও, আনন্দময় সংসার দাও, এই হলেই মেয়েরা খুশি। স্বাধীনতা চায় ছেলেরা, স্বাধীন হ'তে পারলেই তাদের আনন্দ, কিন্তু তাদের দুরন্তপনার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাসন-শক্তি, আত্ম-বিকাশের সুযোগ তারা পাচ্ছে না। তাদের দিগ্বিজয়ী দুরন্তপনায় বাধা ঘটছে, তাই পদে পদে এই রাষ্ট্রবিপ্লব, তাই এত হানাহানি। বাহির যদি থাকে অবারিত, তবেই ত ঘরে থাকার আনন্দ। নৈলে ঘরটা হয়ে ওঠে বন্ধন, হয়ে ওঠে কারাগার। চলতি অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া, আপন আবেষ্টনীর ভিতর থেকে বাহির হয়ে যাওয়া—এই হোলো ছেলেদের প্রকৃতি, কিন্তু পরাধীন দেশে তাদের সে-সুযোগ নেই, তারা মাথা কুটছে দেয়ালে-দেয়ালে, বাদানুবাদ-বিতর্ক-কলহ তুলছে পদে পদে—সমগ্র ভারতবর্ষের প্রকৃত চেহারা এই। আর আমরা?

আমরা এসেছি তাদের আদর্শের যৌক্তিকতা প্রচার করতে, তাদের সেই দুর্গম চলবার পথে আঁচল পেতে দিতে ; পায়ে তাদের কাঁটা না ফোটে।

*মিসেস রায় যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু নিতান্ত আঁচল পাতিয়া দিবার জন্য আসি নাই।* বিশেষ করিয়া আমি আসিয়াছি দূর পল্লীগ্রাম হইতে, সেদিন যদি জানিতাম ছেলেদের আনাগোনার পথে আমাকে আঁচল বিছাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে এবং তাহারই জন্য আমি গোপনে কলিকাতা যাত্রা করিতেছি, তবে সেই আঁচল গলায় বাঁধিয়া আমি ঘরের কড়িকাঠে ঝুলিয়া পড়িতাম। আমার আঁচলের উপর দিয়া অবাধে অচেনা পুরুষের দল হাঁটিয়া যাইবে, আমি কৃতার্থ হইব, তাহাদের কিছু বলিব না, বরং পথের কাঁটা দূর করিব—এ সংস্কার আজিও [illegible]কে স্পর্শ করে নাই তাই রক্ষা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার আগেই এই সকল বাণী শুনিতেছি, স্বাধীন হইলে ছেলেরা হয় ত আমাদের মাড়াইয়া চলিয়া যাইবে। মিসেস রায় সেদিন হয় ত আমাদের দুর্গতি দেখিয়া রবিঠাকুরের ভাষায় বলিবেন, পুরুষের পদতলদলিতা হওয়াই ত নারীজীবনের সার্থকতা। হে ঈশ্বর, ভারতবর্ষ চিরদিন পরাধীন থাকুক।

কিন্তু পরিহাস করিব না। মিসেস রায়ের কথা আংশিক সত্য। যে পুরাতন সংস্কার মেয়েদের ছোট করিয়া, দুর্বল করিয়া, মেরুদণ্ডহীন বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, মিসেস রায়ের ভাবাটা সেই সংস্কারের

একটা ভদ্র রূপ। তাঁহার ধারণা ও কল্পনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নৈলে আধুনিক কালে আর কোনও দেশে নারীত্বের এমন ব্যাখ্যা প্রচলিত নাই। এতকাল মেয়েরা কাঁদিয়া জয়লাভ করিয়াছে, পায়ে পড়িয়া কাজ আদায় করিয়াছে, অধর ফুলাইয়া স্বার্থসিদ্ধ করিয়াছে। আমরা কয়েক জন মিলিয়া ভাবিতাম, মেয়েদের স্বভাবের গতিশীলতা দেখিতে পাইব না কেন? এমন দিন কি আসিতে পারে না যে, মেয়েরা ছেলেদের পায়েতেও লুটাইবে না, মাথার উপরেও চড়িবে না, বরং কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইবে? গ্রহণ করাই কি তাহাদের স্বধর্ম, দান করিবার হাত কি তাহাদের নাই?

মিসেস রায়ের দোষ দিব না। আমার কথায় শিবরাণীরা রাগ করিবেন কিন্তু এই পাঁচ বৎসর দেশের কাজের ভিতরে আসিয়া কতই না দেখিলাম। পাঁচ বৎসর পূর্বে আমাদের দলে অসংখ্য দেশসেবিকা ছিলেন। আজ তাঁহাদের অনেকেই নাই। কংগ্রেসের কাজ করিয়া, পতাকা উড়াইয়া, জেল খাটিয়া অনেকেই ছোট-খাটো নেত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ কোথায় তাহারা? আমি জানি অনেকেই তাঁহারা প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছেন, অনেকে অজ্ঞাতবাসে গিয়াছেন, কেহ কেহ সন্তান পালন ইত্যাদিতে মন দিয়াছেন—তা দিন, কিন্তু উত্তম শিথিল হইল কেন? হয় ত সখ ফুরাইয়া গেল, নেশা কাটিল—অর্থাৎ পুরুষের নিরাপদ আশ্রয়ে আসিতে পারিলেই মেয়েরা বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া

দেয়। কিন্তু ছেলেদের রক্তের ভিতরে এই চটুলতা নাই, আদর্শটা তাহাদের ধর্ম। তাহারাও বহু প্রণয় করিয়া বহু বিবাহ করিয়াছে, তাহারাও সন্তান পালন করিতেছে, তবু দেশ তাহাদের ঘরে গিয়া ঢুকে নাই, অপরিমেয় উৎসাহে তাহারা নিত্য অগ্রগতিশীল, মরণান্ত পর্যন্ত আদর্শকে তাহারা ধরিয়া আছে।

আজ একাকী পথে চলিতে চলিতে এই সকল প্রশ্নে মন ভারাক্রান্ত হইতেছিল। কিন্তু ইহার নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার নিজের কথা জানি। হুকুম পালন করিতে, বয়স্কাদের ফরমাস খাটিতেই আমি নাম লিখাইয়াছি। বক্তার অভাব ঘটিলে প্রয়োজনমতো বক্তৃতা করিতে পারি, মেয়ের দল লইয়া পথে গিয়া হাঙ্গামা বাধাইতেও পারি কিন্তু নেত্রীত্ব করিবার মতো জ্ঞানবুদ্ধি আমার নাই। আমার প্রশ্নের উত্তর আর কেহ না দিক, নিজের ভিতরে যে ইহার উত্তর পাইবার জন্য মন আকুলি বিকুলি করিতেছে। মিসেস রায় বলিয়াছেন, বড় হ, বুঝবি অথচ বড় হইবার আগে যাহা দেখিতেছি, বড় হইতে আ[illegible] রুচি নাই। তবে কি মেয়েদের সংগ্রামটা একেবারেই ভু[illegible]? তবে কি আমাদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিতরে [illegible]মাজ বিপ্লবটাই প্রধান? আমরা কি ছেলেদের সাহায্য করিবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিয়াছি, অথবা মনোমতো ঘর পাইবার জন্য মনোমতো সঙ্গীর সন্ধানে পথে নামিয়াছি?

শহরের অপরপ্রান্তে এক গলির ভিতরে নবেন্দুর বাড়ীর দরজায়

আসিয়া উঠিলাম। লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া ইতস্তত করিবার ধাত আমার নয়, সোজা উঠিয়া দরজার কড়া নাড়িলাম।

একজন লোক আসিয়া দরজা খুলিল, এবং আমাকে দেখিয়াই বলিল, ভেতরে এসে বসুন, ছোটবাবুকে ডেকে দিচ্ছি।

বলিলাম, কি করেছেন তিনি?

চরকা কাটছেন।—বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি ভিতরে আসিয়া বসিলাম। বিদ্রূপে আমার ঠোঁট আপনা হইতেই উল্টাইয়া গেল।

একটু পরেই চটিজুতার শব্দ করিয়া নবেন্দু আসিয়া ভিতরে দাঁড়াইলেন। নমস্কার বিনিময়ের বালাই নাই, সৌজন্যের পালা অনেকদিন চুকিয়া গেছে। বলিলাম, যান নি কেন আপনি?

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, তারপর আমারই পাশে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া বলিলেন, গলার আওয়াজে এত উত্তেজনা কেন? রাগ বুঝি পড়ে নি?

যান নি কেন তাই বলুন। জানেন কতদূর থেকে আসতে হয়েছে।

তিনি উঠিয়া সুইচ্ টিপিয়া পাখা খুলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি গেলেও ত অত দূরে যেতে হোতো। পরের পরিশ্রমটা বুঝি চোখে পড়ে না?

বলিলাম, আপনাদের নেতা হবার সখ, পরিশ্রম না করলে প্রতিষ্ঠা নেই; কিন্তু আমাকে খাটান কেন? জানেন, রাণীদি কী ভয়ানক চটেছেন?

নবেন্দু বলিলেন, তিনি কি চট্‌তে জানেন?

তার মানে?

মানে, রাগ জিনিসটে তাঁর ধাতে নেই। তিনি কাদার পুতুল। মানে, আমি তাঁর নিন্দে করি নে, তবে—

উত্তেজিত হইলাম। রাণীদির নিন্দা আমি সইতে পারি না। বলিলাম, আমি কিন্তু একথা তাঁর কানে তুলবো।

আরে তুল্‌বে বলেই ত বলছি। ঠাণ্ডা হও, একটু সরবৎ এনে দিই, কেমন?

বলিলাম, আপনার মুখের এই বাক্য শুন্‌লে তিনি কাঁদবেন, তা জানেন?

নবেন্দু হাসিয়া বলিলেন, [illegible], ওইটেই তিনি ভালো জানেন। বায়ুর ধাত, কান্নাটা সহজেই আসে। তুমি এত পারো আর তোমার রাণীদিকে সংসারী করতে পারলে না? এমন অনিয়ম আমি দেখি নি। ঘরের বউ হলে যাকে মানায়, সে নামে দেশের কাজে। পাঁচজনকে খাওয়াবো, স্বামীর ঘর করবো, ছেলেপুলেদের মানুষ করে তুলবো—স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য—তা নয়! দেশ! দেশের কাজ করবো, মিটিং করবো, লীডারী বজায় রাখবো—আরে, যার কর্ম তারে সাজে! এই ধরো তুমি, একেবারে আদি ও অকৃত্রিম। গলার আওয়াজে, ব্যবহারে, হাবভাবে—কোথাও রসকস নেই। এই ত চাই—হৃদয় সমস্যার ধার ধারলে দেশের কাজ চলে না।

হাসিয়া বলিলাম, আপনার সুখ্যাতিটা আমার পক্ষে গালাগাল, মনে রাখবেন। আপনি নিজে কি, আমি বুঝি জানি নে? সাবধান,

আমাকে কিন্তু চটাবেন না, ফাঁস ক'রে দেবো ব'লে দিচ্ছি। সেদিন কার হিষ্টিরিয়া হয়েছিল শুনি? রাণীদির, না আপনার? আমি বুঝি আড়াল থেকে শুনি নি কিছু?

নবেন্দু হাসিয়া বলিলেন, তুমি দেখছি লোক ভালো নও। দিন দিন এই বিদ্বে বাড়ছে তোমার? এজন্মে আড়ি পাতলে পরের জন্মে বিধবা হ'তে হয়।

বলিলাম, হ'লে বাঁচবো, বাঙ্গলা দেশের পুরুষ আবার মানুষ!

বটে! আর মেয়েরা বুঝি সব বীরাঙ্গনা, নয়? খেঁদি, পাঁচি, হাবলি—

থামুন, জ্যাঠামি করবেন না। মা-বোনের ওপর এত ঘেন্না, আর উনি করবেন দেশের কাজ—ছাই, ছাই, ছাই, নেতা আপনি। যান, চরকা কাটুন গে, ওই আপনার নিষ্ফল নেতৃত্বের শেষ পরিণাম, ওতেই আপনাকে মানাবে। একটা টিকি রাখুন, মাথাটা ন্যাড়া করুন।—এই বলিয়া আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম।

নবেন্দু বলিলেন, বসো, সিঙ্গাড়া খাওয়াবো। আচ্ছা, আমি একটা কথা ভাবছি। ভাবছি তোমার সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার প্রভেদটা কোথায়? আহার আর পরিশ্রম ছাড়া কি তোমার কাজ নেই?

এবার হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, মশাই, ওতেই আমার গৌরব, ওই নিয়েই যেন মরি। যারা হৃদয়বৃত্তি নিয়ে গড়ের মাঠে রাতের বেলা থিয়েটার করতে যায়—

## ঘুমভাঙার রাত

**কী বললে ?**

বলিলাম, চুপ, নৈলে আপনার নেতাগিরি ধরিয়ে দেবো। আমাকে বলা হোলো, গাড়ীতে থাক্ যমুনা, তোর জন্যে 'পোটাটো চিপ্‌স্' কিনে আনি! একঘণ্টা যায় দুজনের 'পোটাটো চিপ্‌স্ কিন্‌তে? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি সাক্ষী আছে, তাঁর মেমোরিয়ালের আড়ালে গিয়ে—বেশ, বেশ আপনারা।

তারপর।—নবেন্দু বলিলেন।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম, আমি আপনাকে সহ্য করতে পারিনে, দেখলেই রাগ হয়!

অপরাধ ?

আপনি একটি নিখুঁৎ ভণ্ড!

মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু।—নবেন্দু চোখ রাঙ্গাইলেন।

যাক্, ভয় করি নে। সবাই জানে আপনি কেবল ঠকাচ্ছেন।

**কাকে ?**

বলিলাম, যাকে ঠকানো পৃথিবীতে সকলের চেয়ে সহজ!

নবেন্দু বলিলেন, ও, বুঝতে পেরেছি। শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে তিনি পাঠিয়েছেন, কেমন ? আচ্ছা, যাবো যাবো। তিনি বোধ হয় উপুড় হয়ে কাঁদছেন এতক্ষণ ?

বয়ে গেছে তাঁর কাঁদতে—চিনেছেন তিনি আপনাকে।

তবে আর কি, সু-খবর। চিনে যদি থাকেন তা হ'লে আর

কান্নাকাটির দরকার নেই। একটু শক্ত হয়ে শিরদাঁড়া সোজা ক'রে তাঁকে হাঁটতে বোলো, বুঝলে যমুনা ?

এবার গম্ভীর হইয়া বলিলাম, আপনি বুঝি পরের কাছে এমনি নিন্দেই তাঁর করেন ?

নবেন্দু হাসিমুখে জবাব দিলেন, নাঃ নিন্দে করবার মতো খ্যাতি তাঁর এখনো অবশ্য হয় নি—আরে, আমার মুখের নিন্দে যে রাতারাতি তাঁকে বিখ্যাত ক'রে তুলবে, তাই কি পারি ?

আপনি নিজে খুব নামজাদা লোক ব'লে বুঝি আপনার ধারণা ? এ অহঙ্কার কিন্তু সইবে না। আপনার ওপর যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল, আজ সেটুকুও—বলিয়া সটান উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

নবেন্দু ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, আরে বসো বসো, তোমাকে ত রসিক ব্যক্তি ব'লে জানি, তবে রাগ করো কেন ? মেয়েদের পরিহাস-বোধ বড় কম ! দাঁড়াও, লেবুর সন্দেশ তোমাকে আনিয়ে দিচ্ছি।

আহারের লোভে পুনরায় বসিলাম। একথা মনে রহিল না, নবেন্দু ইতিমধ্যে আমাকে তিনবার আহারের লোভ দেখাইয়াছেন। আমি যে তাঁহাকে কোনওদিন কিছুতেই পছন্দ করিতে পারি নাই তাহা তিনি, শিবরাণী এবং আমি—তিনজনেই সুস্পষ্ট জানি। আমি পছন্দ না করিলে উভয়ের কিছু আসে যায় না, পৃথিবীর সকলকে পছন্দ করা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, কিন্তু শিবরাণীর জন্য করিতে পারি না, এমন কাজ সংসারে কী আছে ? আমি গম্ভীর মানুষ ভালোবাসি, যাহার মুখে হাসি থাকিবে না, যাহাকে শত

চেষ্টাতেও কাছে আনা যায় না, প্রাণপণ করিয়াও যাহার মন ভুলানো যাইবে না, মাথা খুঁড়িলেও যাহার হৃদয়-রহস্য জানা অসম্ভব! নবেন্দুর দল? ইহারা অতি সাধারণ, অতি পরিচিত!

নবেন্দু বলিলেন, মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হোলো যমুনা?

মুখ তুলিয়া বলিলাম, আপনার লেবুর সন্দেশ কোথায়?

অবাক করলে তুমি! এখনো ভুলে যাও নি? খাওয়াবো বল্লেই বুঝি সেটা বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়?

বলিলাম, বেশ, আপনিও মনে রাখবেন যে, আমাদের ওখানে আবার পাত পাড়তে হবে।

তোমরা আবার আমাকে খাওয়াও কবে?

বলিলাম, নেমকহারাম। নিউ মার্কেট্ থেকে জেলী কিনে এনে আপনার পাতে দেওয়া হয়েছিল তখন ত খুব খেতে পেরেছিলেন?

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; সত্য কথা বলিতে কি, মেয়েমানুষের চক্ষু যে সকল ছেলেকে রূপবান বলিয়া মনে করে, নবেন্দু তাহাদেরই একজন। কিন্তু পুরুষের পৌরুষেরই অর্থ আছে, রূপের অর্থ সামান্য, একথা কয়জন ছেলেই বা জানে! খুশি হইবার কারণ নবেন্দুর চেহারায় ও ব্যবহারে অনেক ছিল, শিবরাণী যে ভুল করিয়াছেন এমনও বলিতে পারি না, কিন্তু নবেন্দুর ভিতরে সেই বিরাটত্ব কোথায়? কোথায় সেই অতি-মানবের অসহনীয় রুক্ষতা?—এমন আরও প্রশ্ন মনে মনে করিতে ছিলাম, নবেন্দু বলিলেন, কমিটির মিটিংয়ে আমার কি না গেলেই চলবে না?

না গেলে রাণীদির চলবে, কিন্তু দেশের কাজ যে চল্‌বে না। দেশ যে আপনার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ব'সে রয়েছে, আপনার যাওয়া যে চাই।

বুঝলাম তোমার পরিহাস। আমার জন্ত তাঁর এত উদ্বেগ, দোহাই, এ যেন তুমি ছাড়া আর কেউ না জানে। বেশ, সুধু হাতেই যাবো, দলিলপত্র সব বেহাত হয়ে গেছে, আবার নতুন ক'রে তৈরী করতে হবে।

সবিস্ময়ে বলিলাম, বেহাত হয়েছে মানে?

মানে, তোমার আসবার ঘণ্টাখানেক আগে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী হয়ে গেছে, এই কথা তাঁকে জানিয়ো। আর ব'লো, তাঁর বইগুলো যদি ফেরৎ নিতে হয় তবে পুলিশে দরখাস্ত করতে হবে।

বুঝিলাম, আমাদের আর বেশিদিন নয়, আমাদের আবার কিছুকালের জন্য সরকারি বিশ্রামাগারে যাইতে হইবে। এখন হইতে কেবল একটা অজুহাতের অপেক্ষা, এই মাত্র। বলিলাম, রাণীদির নোট বইখানা?

নবেন্দু বলিলেন, সেইখানাতেই তাঁদের আসল প্রয়োজন ছিল। আমাদের ভাঁড়ার ঘরের কড়িকাঠের ফাটলে সেখানা লুকিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে যে পুলিশের এত ব্যুৎপত্তি ছিল আগে জানতাম না। খবরটা তুমি অবশ্যই তাঁকে দেবে, আর তিনি যে অতঃপর একটু সতর্ক থাকবেন, এ বলাই বাহুল্য।

এইবার আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দুই হাতে নবেন্দুর একখানা হাত ধরিয়া বলিলাম, অনেক কটূক্তি করেছি আপনাকে। এর পর আপনি যদি একবার দু'একদিনের মধ্যে রাণীদির খবর না নেন্—ওরা নিশ্চয়ই এবার আপনাকে গ্রেপ্তার করবে—আপনি না গেলে তাঁর কী অবস্থা হবে জানেন?

সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের আমরা একে একে এমনি করিয়াই বিদায় দিয়াছি, বেশ জানি নবেন্দুকেও শীঘ্র হারাইতে হইবে। তিনি যে কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন তাহার সামান্য সন্ধানও আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিবে না। তাহার পরে যে কি হইবে না হইবে, কোন্ তরঙ্গ কোথায় শিবরাণীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার কূল-কিনারা আমাদের কল্পনার বাহিরে।

তিনি চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া আমি তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। বলিলাম, আপনার বলবার কি কোনো বাধা আছে?

করুণ চক্ষে হাসিয়া নবেন্দু বলিলেন, যাবার আগে অবশ্যই দেখা হবে।

আমি আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলাম না। যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি করিয়াই বাহির হইয়া গেলাম। নবেন্দুও পিছনে পিছনে আসিলেন। পথে আসিয়া দেখিলাম, একটি লোক রাস্তার ওপারে অনিমেষ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার একাগ্র তপস্যা লক্ষ্য করিয়া আমি এবং নবেন্দুবাবু দৃষ্টিবিনিময় করিয়া হাসিলাম। তাহার পরেই দ্রুতপদে আমি চলিয়া গেলাম।

## পাঁচ

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, শিবরাণী উপস্থিত নাই। একটু চিন্তিত হইলাম। আজকাল কেহ কাহারও কিছুক্ষণ দেখা না পাইলে একটু অস্বস্তি বোধ করি। কিছুকাল হইতে বাতাসে-বাতাসে যেন কেমন একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছিল। শিবরাণী তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইতেছিলেন, চিঠিপত্র লিখিতেছিলেন। দুইবার কারারুদ্ধ হইয়া কারাগারের বৈচিত্র্য আমাদের নিকট আর কিছু নাই, ওটার সহিত আমাদের জীবনের একটা অংশ যেন মিলিয়া গিয়াছে। এখানে আমরা এই কথা ভাবিলাম, কোন সময়ে কারাগারে গেলে আমাদের কাজের পক্ষে সুবিধা হইবে। পরিবারের মধ্যে, বন্ধু-সজ্জনের মধ্যে এমন কোনোরূপ বন্ধন আমরা সৃষ্টি করিতাম না, যাহার জন্য যাইবার সময় আমাদের পিছন দিকে টান্ পড়ে, —আমরা সেদিকে খুব সতর্ক থাকিতাম। আমাদের গৃহসজ্জা পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে সেজন্য সচরাচর আমরা বাহিরের লোককে শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিতে দিতাম না। গৃহস্থালীকে আমরা প্রশংসা করিতাম, শ্রদ্ধা করিতাম, এমন কি হয় ত মনে মনে ভালোও বাসিতাম, কিন্তু ইহা আমাদের নিঃসংশয়ে বিশ্বাস ছিল যে, ওই সকল আমাদের জন্য নয়। আহার-বিহার, শয়ন-প্রসাধন সম্বন্ধে আমরা এত কাল কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আসিয়াছি, জানিতাম এ সকল যেদিন পাইব না, সেদিন অনন্ত দুর্গতি। ছোট ছেলেমেয়েদের নিকট হইতে আমরা দূরে থাকিতাম, পাছে তাহাদের বন্ধনে পড়িয়া

যাই। নাটক-নভেল আমরা ছুঁইতাম না, পাছে তাহাদের ভিতর হইতে কোনোরূপ অলস কল্পনা বিলাস আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। এ সকল ছাড়াও আর যাহা করিতাম, তাহা মেয়েমহলের সহিত ঘনিষ্ঠ মেয়েরাই বুঝিতে পারিবে, ব্যক্ত করিয়া না বলিলেও চলে। পুরুষের বিশ্বাস আমাদের মধ্যে নাই, তাহারা বন্ধন কাটিতে জানে বলিয়া যে কোনো সময়ে বন্ধন স্বীকার করে; কিন্তু আমরা তাহা জানি না, আমাদের ধাতু ভিন্নজাতীয়, পাছে কিছুতে বাঁধা পড়ি এই আশঙ্কায় আমাদের পলাইয়া বেড়াইতে হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বাঁধা পড়িতেই আমাদের সমগ্র জীবন উন্মুখ হইয়া থাকে।

শিবরাণীকে খুঁজিতে বাহির হইব কিনা ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া আসিলাম। বেলা দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। নবেন্দুর সংবাদ কি ভাবে শিবরাণীকে জানাইব তাহাই ভাবিতেছিলাম। এমন সময় দরজার কাছে কাহার পায়ের শব্দ পাইলাম।

একটি মেয়ে পরদার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে দেখিয়া প্রথমটা সে ইতস্তত করিল, পরে ডাকিল, যমুনাদি—

বলিলাম, দুপুরবেলা বেরিয়েছ কেন মিন্টু?

সে কহিল, আপনি একবার আসুন।

কোথায়?

আমাদের আশ্রমে।

কেন বলো ত?

বিশেষ দরকার। আমি ইতিমধ্যে দুবার এসে আপনাকে খুঁজে গেছি!

বলিলাম, আচ্ছা যাচ্ছি একটু পরে, তুমি এগোও।

আমার স্নানাহার করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মিণ্টু তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, সব কাজ ফেলে আপনাকে এক্ষুণি যেতে ব'লে দিয়েছেন।

বলিলাম, কার এই হুকুম?

সে বলিল, রাণীদি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

রাণীদি! রাণীদি কি সেখানে? চলো, চলো।

জামাটা মাত্র ছাড়িয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ সেটা পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া মিণ্টুর সহিত বাহির হইলাম। পথে দ্রুত চলিতে চলিতে বলিলাম, বিশেষ দরকার! কোনো বিপদ ঘটে নি ত? রাণীদি ভালো আছেন?

মিণ্টু বলিল, হ্যাঁ, তিনি ত ভালই আছেন, কিন্তু—

যাক্, আমার স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। সংসারে দুঃখ আছে জানি, বিপদ-আপদ আছে তাহাও জানি, সুতরাং অধীর হইবার কারণ নাই। রাণীদিকে আমি ভালো বাসিয়াছিলাম, তাঁহার বিপদপাত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে আমার আহারে রুচি চলিয়া যায়, আমার চোখে কান্না আসে। আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কে আছে আর কে নাই, তাহার হিসাব আমি দাখিল করিব না, গ্রাম্য-জীবনের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি; বাল্যাবধিই সেখানকার

নাড়ীর সহিত আমার যোগ ছিল না। শহরে আসিয়া চারিদিকে নানারূপ দৃশ্য দেখিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; সাধু বাঙলায় যাহাকে বলে নারীত্বের বিকাশ। কেমন করিয়া এই বিকাশটা ঘটিল তাহা অনেক সময়ে ভিতরে ও বাহিরে চোখ মেলিয়া দেখিয়াছি। অনেক সময়ে লজ্জিত হইয়াছি, অনেক সময়ে অন্য মেয়ের নিকট গোপনে খোঁজ লইয়া সান্ত্বনা পাইয়াছি। পুরুষ মানুষ কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি ফলভারাবনত বৃক্ষের ন্যায় নোয়াইয়া পড়ি না, উদ্ধত হইয়া চোখ মেলিয়াই থাকি, তাহারা আমাকে কি ভাবে দেখে তাহার খোঁজ রাখি না, আমি তাহাদের কি ভাবে দেখিলে বেশ মানায় তাহাও জানি না। এই লইয়া অনেক সময়েই 'বেহায়া' বনিয়াছি বন্ধুরা প্রায়ই নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, লজ্জা-সরম তুমি কবে রাখিবে, তোমার জ্ঞানগম্যি না হইলে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়। আরও অনেক কথা তাঁহারা বলেন, যাহার ইঙ্গিতমাত্র শুনিলে চক্ষের পলকে শিবরাণীরা ধরিয়া ফেলেন, আমি কিন্তু রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া তাহাদের সকল কথার অর্থ অনুধাবন করিতে থাকি। এমনি করিয়াই কুড়ি বৎসরটাকে ডিঙাইয়া আসিলাম, আর দশটা বৎসর পার হইয়া গেলে ভগবানের আরাধনা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে থাকিব। বিবাহ? সংসার? ছি ছি, আমি কি এতই সাধারণ? ওইগুলি অবলাদের সম্বল, বড়লোকদের বিলাস। শুনিয়াছি বিবাহ করিলে স্বামী নামক জীবের অনুজ্ঞা পালন করিতে হয়—স্বামীর

মুখ-চাওয়া কয়েকজন বন্ধুকেও দেখিয়াছি বটে, তবে দম্ভটা নাকি আমার সহজাত, সেই কারণে তাহাদিগকে কৃষ্ণের জীব ছাড়া আর কিছু বলিয়াই গণ্য করি না। বিবাহ আমিও হয়ত করিতাম, চেহারাটাও বিশ্বের প্রয়োজনে লাগিবার মতো হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু করিব কাহাকে? অনেক দেখিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। ইহাই বুঝিয়াছি, পরাধীন দেশের শতকোটি নোংরামির মধ্যে সে জন্মিবে না, স্বাধীন দেশেই তাহার দেখা মিলিতে পারে।

আসুন, ওঁরা বাইরেই রয়েছেন।

পথ বেশি দূর নহে, যখন-তখন যাতায়াত করিতে হইবে এইজন্য কাছাকাছির মধ্যে আশ্রমের বাসাটা লইতে হইয়াছিল। মিণ্টুর পিছনে পিছনে আমি ভিতরে আসিয়া উঠিলাম। নিকটেই নানা বয়সের মহিলারা বসিয়া ছিলেন, আমাকে আসিতে দেখিয়া সসম্মানে পা গুটাইয়া গায়ের কাপড় টানিয়া ভব্য হইয়া বসিলেন। আমি যে খুব কড়া মেয়ে এবং আমি যে এই আশ্রমের সেক্রেটারী—ইহা আমি ছাড়া আর সকলেই মনে করিয়া রাখেন। এই বাড়ীতে পদার্পণ করিলেই বুঝিতে পারি এখানে আমার স্থান কোথায়! অবশ্য নিজের কৃতিত্বে এই উচ্চাসন পাই নাই, ষড়যন্ত্র করিয়া অথবা অন্যের দাবিকে দাবাইয়াও এই আসন লাভ করি নাই, তবে শিবরাণীর মতো মুরুব্বি থাকিলে সংসারে কি না হয়। বলা বাহুল্য, পদটা অবৈতনিক।

মেয়েরা একই ভঙ্গিতে একইরূপ ম্লান মুখে মাথায় হাত দিয়া

করুণ চক্ষে বসিয়াছিল, শোকাকুলতার এমন নিখুঁৎ মঞ্চ-অভিনয় আগে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। প্রত্যেকের একটি চক্ষু শোকার্ত, অপরটি কৌতূহল, শঙ্কা ও চাতুরীমিশ্রিত। দেখিয়া রাগ হইল। ইহাদের আমি অনেক দিন হইতে জানিতেছি, সুতরাং চিনিতে বাকি নাই। কণ্ঠে বিদ্রূপ মিশাইয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলাম, গোপিনীরা এত ব্যথিত কেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করেছেন? বলি, ব্যাপার কি বলো ত, ওগো ওই বিধুমুখী?

বিধুমুখী এখানে কাহারও নাম নাই, কিন্তু যাহাকে ওই নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে আবার তাড়নার ভয়ে অকস্মাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, আমি কিছু জানি নে, পা ছুঁয়ে আপনার দিব্যি করতে পারি, আমি ছিলুম সেই ওদিকের ঘরে—একে ত আমি জ্বরে ভুগছি—

কাঁপুনে জ্বর নাকি?

হ্যাঁ, যমুনাদি।

একটা চোখ মট্‌কাইয়া তিক্ত বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম, জ্বরটা বোধ হয় এইমাত্র এলো?—বলিয়া আর দাঁড়াইলাম না, আমি যে ঘরে বসিয়া অফিসের কাজ করি সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

শিবরাণী ছিলেন সেই ঘরে, আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিলেন। চোখ দুইটি তাঁহার রাঙ্গা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে—কত যে কাঁদিয়াছেন তাহা সেই চোখ দুটিতে যেন সুস্পষ্ট লেখা ছিল। সাম্রাজ্ঞীর মতো যে সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য তাঁহার চেহারায়, এখন তাহা

যেন শিশুর মতো সরল ও অসহায়। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া তাঁহার মুখখানি আমি গলার ভিতরে টানিয়া নিলাম। বলিলাম, রাস্তায় নেমে এসে তুমি ত কোনোদিন চোখের জল ফেলো নি রাণীদি? এমন কি ঘটেছে?

শিবরাণী বলিলেন, আমার কপালে কী কলঙ্ক দিল এরা ভাই, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল অশ্রুমতী!

বলিলাম, গলায় দড়ি? কেন? কোথায় সে?

হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

মারা গেছে?

না।—শিবরাণী কহিলেন, দরজায় খিল দিতে ভুলে গিয়েছিল, ওরা এসে চেঁচামেচি ক'রে ধ'রে ফেলে। ওবাড়ীর চাকর মধুসূদন এসে নামায়। পড়াময় হৈ চৈ। পুলিশে খবর যায়, তার পর অশ্রুমতীকে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে গেল হাসপাতালে—এখন একটু জ্ঞান হয়েছে। অশ্রু বাঁচলো, কিন্তু আমরা যে ম'রে গেলাম যমুনা? কেমন ক'রে বাইরে মুখ দেখাবো?

আমি যে তাঁহার বয়সে ছোট একথা কেমন করিয়া না জানি ভুলিয়া গেলাম। তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলাম, অন্যের কৃতকর্মের জন্য তুমি ত দায়ী নও? কেন অশ্রুমতী এমন কাজ করলো বলো দিকি?

শিবরাণী কহিলেন, আমাদেরই নিয়তি। লোকে এতদিন আমাদের মিথ্যে বদনাম দিত, আমাদের নামে কলঙ্ক রটিয়ে আনন্দ

পেত, এবার তারা হাতে-নাতে ধ'রে ফেলবে। চল্ যমুনা, আমরা কোথাও চ'লে যাই।

তাঁহার ছেলেমানুষী দেখিয়া আমার হাসি পাইল। নিজ জীবনে দেখিয়াছি, আমি ত্যাগ করিলেও অন্যে আমাকে ত্যাগ করে না, বরং পিছু নেয়। গ্রাম হইতে চলিয়া আসিবার দিন বয়স আমার অল্প ছিল, কিন্তু কলঙ্ক রটনায় মেয়েমানুষের পাঁচ ও পঞ্চাশ একই কথা। আজিও আমাকে লইয়া সেখানকার পালাকীর্তন অব্যাহত আছে—সে সংবাদ এই সেদিনও পাইয়াছি। সেই কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম, চ'লে গেলেই কি অপবাদের হাত এড়ানো যায় রাণীদি ?

শিবরাণী বলিলেন, যায় না জানি, কিন্তু কাছে থেকে কানে শোনার চেয়ে—

বলিলাম, মেয়েমানুষের নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই, বিশেষ ক'রে তোমার মতো মেয়ে। কাজ তুমি না ক'রে থাকতে পারবে না, অথচ কাজের পুরস্কার এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার চেয়ে আমি বলি, এই আমাদের কাজ। সকল কলঙ্ক আর দুর্যোগ কাটিয়ে এমনি করেই আমাদের চলতে হবে। দেশের কাজের চেয়ে দেশের মানুষের কাজ অনেক বেশি দরকার, রাণীদি।

কিন্তু আমাদের নিজেদের অবস্থা ?

দেখতেই পাচ্ছ। সুখে দুঃখে আন্দোলিত হ'লে চলবে না, কলঙ্ক আর অপবাদ পথের পাথেয়, ভবিষ্যতের চিন্তা বে-আইনী,

গৃহধর্ম স্বপ্নবৎ, আশা-আকাঙ্ক্ষা চির নির্বাসিত, পুরস্কার—লোকনিন্দা, সান্ত্বনা—আমাদেরই চোখের জল।

শিবরাণী আমার হাতটা ভয়ে ভয়ে জোরে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, আমরা কি মানুষ নয়, যমুনা?

বলিলাম, না।

তিনি মুখের দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম, মানুষ আমরা নয়, রাণীদি, আমরা দেশের কর্মী। তুমি কি কোনোদিন দেখেছ, দেশের যাঁরা সাধারণ কর্মী, নেতারা কোনোদিন তাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের খবর নিয়েছে? এই কাজে অনেকেই ত জীবন দিলে, অকালে ত অনেকেই ঝ'রে গেল, বাহবাও কিছু পেলে, কিন্তু তাদের সত্যকার পিপাসার ইতিহাস কে কতটুকু জান্‌লো? দেশের জন্য ত্যাগ ত অনেকেই করেছে, কিন্তু আত্মবিস্মৃত দেশপ্রেম সর্বোত্তম ত্যাগ—এ শিক্ষা ক'জনের আছে বলতে পারো?

শিবরাণী বলিলেন, এদের নিয়ে এখন কি করবো?

বলিলাম, তোমার সাধ্য কতটুকু? যা করেছ তাই অনেক, যা করতে পারবে না তার জন্যে দুঃখ নেই। এদের ছেড়ে যদি চ'লে যেতে চাও, পথ তোমার অবারিত রয়েছে। যাও, গিয়ে বিয়ে করো, ব্যাঙ্কে টাকা জমাও, গয়না গড়াও—কে তোমাকে মানা করবে? বরং খুশি হয়ে বলবে, পয়মন্ত বউ। কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ, এদের তুলতে গিয়ে এদেরই হাতে লাঞ্ছিত হওয়া। সত্যি কথা বললে রাগ ক'রো না। এদের জন্য কী করেছি আমরা?

কিছুই না। এই যে আশ্রম, এও' আমাদের নিজেদেরই কাজের বিজ্ঞাপন রাণীদি! কতকগুলো দুর্বল-স্বভাব মেয়েদের পথ থেকে কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করেছি, এই মাত্র। এতে আমাদের অবশ্য কিছু প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু ওদের কোনো কাজ হয় নি। আহারের চেয়ে এখন ওদের আলো দরকার, আমরা ওদের চোখ বন্ধ রেখে কেবল স্থূল আহার যুগিয়ে চলেছি, এতে যে-সব বিকৃতি ঘটবার তা ঘটেছে।

আশে পাশে লোক জানাজানি হইয়াছে। ঘরে বসিয়া আমরা কথা বলিতেছিলাম বটে কিন্তু বাহিরে যাইতে আমাদের মাথা কাটা যাইতেছিল। অপরাধ যেন অশ্রুমতীর একার নহে, তাহার সঙ্গে এই আশ্রমের সকলেই যে অপরাধ করিয়াছে, ইহাই যেন প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের উভয়ের অপরাধই যেন সকলের অপেক্ষা বেশি, ভয়ে ভয়ে আশপাশে তাকাইয়া তাহা যেন আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতেছিলাম। আমাদের আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

হাসিয়া বলিলাম, তুমি চোরের সর্দার, একথা মনে রেখো।

শিবরাণী বলিলেন, তুইও ত একজন অনুচর ভাই?

বলিলাম, কলঙ্ক তাকেই ধরে কলঙ্কের ভয়ে যে ভীত। আমি ত নাককাটা সেপাই।

তিনি বলিলেন, কলঙ্ক আমাদের নামে এত সহজে রটে কেন রে?

কলঙ্কের অপরাধ নেই। আমরা যে কলঙ্কবিলাসিনী, কলঙ্ক

আমাদের ভূষণ! কপালে কলঙ্কের একটু দাগ থাকলে এখনকার সমাজে খাতির কত, জানো?

দূর হ, মুখপুড়ি।—বলিয়া শিবরাণী মুখ ফিরাইয়া নিলেন।

খানিক পরে বলিলাম, ওঠো রাণীদি, বেলা যে তিনটে বাজে!

তিনি বলিলেন, রাস্তায় পা দেবো কেমন ক'রে?

বলিলাম, ঠিক যেমন ক'রে এসেছিলে তেমনি ক'রে। এসো আমার সঙ্গে তুমি। যা হবার তা হয়েছে, এরপর আশ্রমটা এখান থেকে তুলে অন্য জায়গায় স্থাপনা করতে হবে।

সেখানে গিয়েই কি এদের আটকে রাখতে পারবো? এদের ত আমি বিশ্বাস করতে পারি নে?

বলিলাম, আট্‌কে রাখলে বিশ্বাস ওরা ভাঙবেই, এই কথাটা ভাবছো না কেন? মেয়েমানুষের প্রকৃতি তোমার বাঁধাবাঁধি স্বীকার করবে কেন রাণীদি? তার পাওনা গণ্ডা সে ছাড়বে কেন?

শিবরাণী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। অর্থাৎ, ভাবটা এই, আমার মুখেও এই সাংঘাতিক কথা! আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি সকরুণ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, ছি যমুনা, এমন সব কথা আর কোনোদিন বলো না, কুমারী মেয়ের মুখে এ সব কথা মানায় না।

বলিলাম, যাকে বাধ্য হয়ে গলায় দড়ি দিতে হয়েছে তারও স্বামী নেই। তুমি এখন এসো দিকি, বেলা একেবারে প'ড়ে এলো।

## ছয়

এই আমাদের আশ্রমের ইতিহাস। কাজ আমরা অনেক করিবার চেষ্টা করি কিন্তু তাহার বাঁধুনি দিতে পারি না। কল্পনা আছে প্রচুর কিন্তু তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার যে রীতি কৌশল তাহা আমাদের হাতে নাই, সে কাজ পুরুষের। সত্য কথা বলিতে কি, পুরুষ ছাড়া মেয়েদের সকল কাজই অচল। আজ নারী-আন্দোলন বলিয়া বাজারে যাহা চলিতেছে তাহা পুরুষের সৃষ্টি, অন্তত অনেকখানি, একথা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমাদের আন্দোলন লইয়া প্রচারকার্য যাহা হইয়াছে, তাহা পুরুষই করিয়াছে, সংবাদপত্র তাহাদেরই হাতে। যে সকল চিত্তচমৎকারিণী ভাষা শুনিয়া আমরা কূল ছাড়িয়া অকূলের দিকে পাড়ি দিয়াছি, সেই ভাষা পুরুষের তৈরী। পুরুষই আমাদের জাগিতে বলিয়াছে, পুরুষই আমাদের প্রাণে উত্তম ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে, পুরুষই আমাদের পায়ের শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়াছে, —আমরা নিজেরা কাটি নাই। পুরুষের বাঁশী শুনিয়াই আমরা গৃহত্যাগ করিয়াছি।

পুরুষের কৃতিত্ব প্রচার করিয়া বেড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়। যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই তাহাই বলিলাম। মেয়েদের সম্বন্ধে আমি বিশ্বাস হারাই নাই! আমি জানি তাহাদেরও

স্বাধীন-সত্তা আছে, শিক্ষা ও শক্তি আহরণ করিলে তাহারাও স্বকীয়তা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু যে-পথে তাহারা চলিয়াছে সে-পথ নহে। গোপনে পুরুষের নিকট হইতে সকল রকমের সাহায্য লইব এবং প্রকাশ্যে স্বাধীন বলিয়া নিজেদের জাহির করিব, এই ফাঁকি নিচের তলায় চাপিয়া রাখিলে একদিন তাসের ঘরের মতো আমাদের কীর্তি ধ্বসিয়া পড়িবে। আজকের ঘটনাটা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা আশ্রম নামক একটি পদার্থ গড়িয়াছি, তাহাদের বিধিব্যবস্থাও আমাদের হাতে, কিন্তু কেমন করিয়া যে আমাদের সকল প্রচেষ্টা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া অশ্রুমতীর ন্যায় একটি মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল তাহাই ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। যাহা সহজ ও সুন্দর, যাহা স্বাভাবিক, সেই পথ আমরা ধরি নাই, উল্‌টা পথেই আমরা চলিয়াছি। আমাদের নীতিবোধ, সংযম, শুচিতা, চরিত্রের আদর্শ, সামাজিক বিধি—সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া অশ্রুমতী যেন আমাদের পরাজয়ের চেহারা লইয়া হাজির হইয়াছে। তাহাকে তাড়াইব কোন্ যুক্তিতে, রাখিবই বা কোন্ সাহসে?

অপরাধ সকলেই করে, অশ্রুমতীও করিয়াছে। কিন্তু তাহার বেলায় গলায় দড়ি জুটিবে, এবং পুরুষের বেলা সকল অপরাধের মার্জনা, ন্যায় ও নীতির এই আদর্শ কি আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? মনের ভিতরে একটা কথা শিবরাণীর শাসন উপেক্ষা করিয়াও ফুটিয়া উঠিতেছে, অশ্রুমতী অপরাধ করে নাই। যাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য

হইতেছে তাহা স্বভাব ও স্বধর্ম। যে কঠিন সত্যটা মানুষের জীবনকে অহরহ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাই অশ্রুমতীর আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার বেশি কিছু নহে। সে আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছে যে, একই ছাঁচ সকলের জন্য নহে, স্বভাবের বৈচিত্র্য আছে, প্রকৃতির স্বাধীনতা আছে। আমরা তাহাদের আশ্রয় ও অন্নবস্ত্র জোগাইতেছি, কিন্তু আশ্রিতের প্রাণকে নিয়ত পীড়ন করিবার অধিকার আমাদের নাই, সে অধিকার নিতান্ত নিরীহের উপর খাটাইতে গেলেও পদে পদে আমাদের পরাজয়ই ঘটিবে। অশ্রুমতীর নিকট শিবরাণীর এই শিক্ষাটাই বাকি ছিল।

বিকাল বেলার দিকে আমরা হাসপাতালে গিয়া হাজির হইলাম। আমাদের লজ্জা করিলে চলিবে না, যে গাছ নিজ হাতে পুঁতিয়াছি তাহার ফল অবশ্যই খাইতে হইবে। আমি শিবরাণীর আগে আগে গিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। বারান্দায় লোকজন দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে চিনিত, তাহারা কেহ সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ বা কৌতুক বিদ্রূপে মুখ বিকৃত করিয়া কানাকানি করিল। আমাদের ভ্রূক্ষেপ করিবার সময় ছিল না, খোঁজ খবর লইয়া যে ঘরে অশ্রুমতী আছে তাহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

পুলিশের একজন জমাদার ও ইন্‌স্‌পেক্টর খাতাপত্র লইয়া নানা সংবাদ টুকিয়া লইতেছিল, আমাদের দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

আমরা তাহাদের অপরিচিত নহি, দৃষ্টিবিনিময় করিতেই নমস্কার বিনিময় হইয়া গেল। এই লোকটার হাতে বছর চারেক পূর্বে আমরা গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম, সেই হইতে বিড়াল ও ইন্দুরের সম্পর্কটাই চলিয়া আসিতেছে। ইন্দুর বড় হইয়া মারাত্মক হইয়াছে, এখন আর বিড়ালের লম্ফকেও সে ভয় করে না।

লোকটা ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, আপনারা যে এর মধ্যে আছেন এ আমরা জানতুম না।

কথাটার ভিতরে আমাদের চরিত্রের প্রতি খোঁচা ছিল। অর্থাৎ লোকটা বলিতে চাহিল, রাজনীতির সঙ্গে আমাদের চারিত্রিক দুর্নীতিও জড়িত। শিবরাণী তাহার এই কণ্ঠস্বরে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আমি জবাব দিলাম, বলিলাম, হয় ত এতে আপনাদের ষড়যন্ত্র ছিল।

লোকটা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

চোখ বুজিয়া অশ্রুমতী পড়িয়াছিল। বোধ করি নাক ও মুখ দিয়া তাহার রক্ত পড়িয়াছিল, নাকের গোড়া ও চিবুকের উপরটা রক্তাভ হইয়া আছে। চেহারাটা ম্লান, নিস্তেজ। নিকটে ডাক্তার বসিয়াছিলেন, শিবরাণীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, মুখ তুলিয়া বলিলেন, একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে, তবে এখন একটু নিঝুম হয়ে আছেন। দুধ খাওয়ানো হয়েছে। দিন দুই লাগবে। কলকাতায় এঁর কোনো আত্মীয় নেই ?

শিবরাণী কহিলেন, আজ্ঞে না।

বাড়ী কোথায় এঁর?

রাজসাহীর দিকে।

আপনাদের আশ্রমে কেমন ক'রে এলেন বলুন ত?

তাঁহার পাশে একজন নার্স দাঁড়াইয়া ছিল, প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল। হাসি বুঝিতে পারি, মুখ টিপিয়া হাসি বুঝিতে পারি না। শিবরাণী বোধ করি জড়িতকণ্ঠে কিছু একটা জবাব দিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে থামাইলাম। বলিলাম, এখানে সে সব কথা বলবার দরকার আছে কি?

ডাক্তার বলিলেন, দিন দুই বাদে এঁকে কোর্টে ওরা হাজির করবে, সুতরাং আমার জেনে রাখা দরকার।

আদালতের নাম শুনিয়া শিবরাণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মান সম্ভ্রম আর রক্ষা হইল না, সংবাদপত্রে নানারূপ কেলেঙ্কারী প্রকাশ হইয়া পড়িবে, পুরুষকর্মী ও নেতাগণ সকলেই অসম্মানজনক বিদ্রূপ করিতে থাকিবেন, দেশের লোক আর কেহই বিশ্বাস করিবে না। সকলের অপেক্ষা বিপদ এই যে, এ-পাড়া ও-পাড়া আর কোথাও আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না। শিবরাণীর মাথা হেঁট হইয়া গেল।

পুলিশের লোকটি বাহিরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ আড় চোখে বিশেষ চাতুরীর সহিত আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল, ডাক্তারের কথা শুনিয়া এইবার ভিতরে আসিল। আমার নিকট সে ঘা খাইয়াছে,

সুতরাং এইবার সে শিবরাণীর দিকে ফিরিল। বলিল, আপনারা কি এই কাণ্ডের কিছুই জানতেন না?

শিবরাণীর হইয়া আমি জবাব দিলাম। বলিলাম, জানা সম্ভব নয়, আমরা অন্যত্র থাকি।

যে সমস্ত ছেলেরা আশ্রমের কাজে আনাগোনা করতো তাদের ক'জনকে আপনারা চেনেন?

আমি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, কোনো ছেলেকে আমরা আনাগোনা করতে দেখি নি।

লোকটা এইবার প্রাণ খুলিয়া হাসিল। সেই হাসি অতি অভিজ্ঞ পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর ছাড়া আর কাহারও মুখে দেখা যায় না। হাসি থামিলে সে বলিল, অশ্রুমতীর মুখের স্বীকারোক্তি আপনারা যথাসময়ে শুনতে পাবেন।

ভয় পাইবার কিছু ছিল না, অশ্রুমতী কোন্ কথা স্বীকার করিয়াছে তাহাও আমরা কল্পনা করিতে পারিলাম না, আমাদের এমন কোনও কলঙ্ক চাপা নাই যাহা প্রকাশ পাইলে আমরা অপমানিত হইব, তবুও কেমন করিয়া যেন ভয় পাইলাম। মেয়েমানুষের লজ্জা কোথাও প্রকাশ পাইয়াছে জানিলে মাথা হেঁট হইয়া যায়—এই সংস্কার ও দুর্বলতা আজিও ত্যাগ করিতে পারি নাই। দেশের কাজ করিতে নামিয়াছি, আমাদের বহু বিপদের মধ্যে একটা বিপদ এই যে, আমাদের চরিত্রের অপবাদ বিশ্বাস করতে দেশবাসী উদ্‌গ্রীব, এবং একথা কে না জানে, বাঙলা দেশের কোনো

মেয়ের নামে একবার দুর্নাম রটিলে তাহার মৃত্যুর পরেও তাহা ঘুচিতে যায় না। দুর্নাম সত্য হউক, অথবা মিথ্যা হউক তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত সকলেই, কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিবার মানুষ একটিও নাই। সাত শত বৎসরের পরাধীনতায় কেবল যে আমাদের মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরিয়াছে তাহাই নহে, আমাদের জাতীয় রক্তও বিষাক্ত হইয়াছে।

ডাক্তার ও ইন্‌স্‌পেক্টর বাহির হইয়া গেলেন। নার্সটি কেবল দাঁড়াইয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বুঝিতে বাকি ছিল না, রাজনীতিক কার্যকলাপের জন্য আমাদের জব্দ করিয়া দিবার একটা সুযোগ এইবার ইহারা পাইয়াছে, সুতরাং সহজে ইহা হইতে ছাড়া পাইব না। জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইলে আমরা যে আর বাহিরে মুখ দেখাইতে পারিব না, সভা-সমিতি করিয়া দল পাকাইয়া উৎপাত করাও অসম্ভব হইবে—ইহাই উহাদের একান্ত কাম্য। আজ অশ্রুমতী এমন কোনো কথা যদি স্বীকার পাইয়া থাকে যাহা সত্য হইলেও প্রকাশযোগ্য নহে, স্বাভাবিক হইলেও স্বীকার্য নহে, যাহা নারীপ্রকৃতির কেবলমাত্র মালিন্যকেই উদ্ঘাটিত করে—তবে আমরা কি করিতে পারি? পুরুষ বিচিত্র জগতের জীব। লোকনিন্দায় তাহারা গৌরব বোধ করে, চরিত্রের অপবাদকে তাঁহারা যশের মুকুটের ন্যায় ব্যবহার করে, কলঙ্ক লইয়া তাহারা বিলাস করিতে ভালোবাসে। আমাদের ধর্ম বিপরীত। কানা-কানি বরং সহ্য করিতে পারি কিন্তু জানাজানি হইলেই বিপদ

মানি। কলঙ্ককে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় করি না, যতক্ষণ সে বাহির হইতে না আসে। অশ্রুমতী যদি এমন কথা বলিয়া থাকে যাহা মেয়েদের আদিম দুর্বলতাকে প্রকট করিয়া তুলে তবে অপমানে যে আমরা মরিয়া যাইব!

শিবরাণী বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে ছিলেন। পুরুষ এখন আর ঘরের মধ্যে কেহ নাই কিন্তু নার্সের চতুর দৃষ্টির সম্মুখে অশ্রুকে কোন্ কথাই বা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি? তা ছাড়া প্রশ্ন করিয়া জানিবার কি-ই বা ছিল? অনেক বিষয়ে আমি আজিও অজ্ঞ, হয় ত এই হাসপাতালের কক্ষে দাঁড়াইয়া সকল কথা বুঝিতেও পারিতেছি না, হয় ত আমাকেও একদা কোনো এক অছিলায় গলায় দড়ি দিয়া হাড় জুড়াইতে হইবে, কিন্তু আজ অশ্রুর নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে কুণ্ঠাবোধ হইল। মনে হইল যে-জীবন কেবল পরাশ্রিত, পরান্ন প্রতিপালিত, যাহার অবরোধের বাহিরে অবারিত জীবনের সামান্য আলোক রশ্মিটি পর্যন্ত দেখিবার উপায় নাই, শিক্ষা ও মানবতা যাহার নিকট চির অপরিজ্ঞাত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত দাসী হইয়া থাকিবার কল্পনাই যাহাদের একমাত্র ঐহিক বাসনা, সেই বাঙ্‌লা দেশের মেয়ের আত্মহত্যার কারণ নাই বা খোঁজ করিলাম। একটু আগে অশ্রুমতীর উপরে বিজাতীয় ঘৃণা হইতেছিল, এইবার যেন তাহা এক অদ্ভুত স্নেহে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। সে কেবলমাত্র আত্মহত্যা করে নাই, বরং যে-সমাজ ব্যবস্থা তাহার মনুষ্যত্ববিকাশের সুবিধা দেয় নাই, তাহার বিরুদ্ধে সে

একটা প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছে মাত্র। অশ্রুমতীর অপরাধে রাগ করিব কি, তাহার প্রতি করুণায় আমার চোখ দুইটা ঝাপসা হইয়া আসিল।

আগামী কাল আদালতে ইহাকে হাজির করিবে, সেখানকার জেরায় নানারূপ কথাবার্তা বাহির হইবে—দেশসেবার অপরাধে আমাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পুলিশের দিক হইতে কম হইবে না—তাহার সহিত আমাদের সামাজিক সম্ভ্রম ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবে, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। বেলা ছয়টা বাজে, এখনই একটা সভায় যাইতে হইবে। সেখানে গরম গরম বক্তৃতা দিব, গভর্ণমেণ্টের মুণ্ডপাত করিব, নারীজাতিকে উত্তেজিত হইতে বলিব। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, শিবরাণীর মুখখানা বিবর্ণ, পথ চলিবার উৎসাহ তাঁহার নাই, অপরিসীম ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন। তাঁহাকে একটুখানি খুশি করিবার জন্য বলিলাম, নবেন্দুবাবু সভায় নিশ্চয় আসবেন বলেছেন।

শিবরাণীর এতক্ষণে চমক ভাঙিল। বলিলেন, কেমন ক'রে আমি ওদের কাছে মুখ দেখাবো, যমুনা?

বলিলাম, আমি নবেন্দুবাবুকে আড়ালে ডেকে সব কথা খুলে বল্‌ব।

সে কি! ওরা যে আমাদেরও খারাপ মনে করবে!

বলিলাম, তা করুক, কিন্তু কাল খবরের কাগজে বেরুবার আগে বলা দরকার। চাই কি তিনি ত সাহায্য করতেও পারেন।

শিবরাণী বলিলেন, মনে করবে আমরা বুঝি এই!

বলিলাম, আচ্ছা, সে ভার আমার ওপর রইলো। এসো তাড়াতাড়ি, আর সময় নেই।

সভায় আসিয়া পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। গত কয়েকদিন হইতে শরীর ও মনের উপর দিয়া অতিশয় ঝড় ঝাপটা বহিয়া চলিয়াছিল, সেই জন্য ভাবিয়াছিলাম আজ দুইজনে নির্জনে একটু বেড়াইতে বাহির হইব এবং সেই সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিব। কিন্তু বিধি বাম, অশ্রুমতীর কেলেঙ্কারীটা ধারালো খড়্গের ন্যায় আমাদের মাথার উপর ঝুলিয়া রহিল, আগামী কাল যে কী বিপদ ঘটিবে তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। যাহা হউক, সভায় শত শত লোক উপস্থিত, এবং এই বিপুল জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা দিয়া হাততালি এবং খ্যাতি পাইবার লোভ যে আমাদের ছিল না একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। ভীড় ঠেলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম, মঞ্চের উপরে আসিয়া যখন উঠিলাম তখন আমাদের দুইজনকে দেখিয়া সহসা সকলে সমবেতকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া হাততালি দিয়া উঠিল। আমরা দুইজনে নাকি তরুণসমাজের নেত্রী, স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে মহলে আমরা বীরাঙ্গনা বলিয়া খ্যাত, এবং প্রায়ই শুনি আমরা নাকি দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি—বিবাহ পর্যন্ত করি নাই। আমাদের রূপ ও শারীরিক পরিচয়ের কথা বলিব না, পাঁচজনে তাহা বলিবে—তবে অশ্রান্ত হাততালি ও জয়ধ্বনির ভিতরকার রহস্যটা মনস্তত্ত্ববিদরা অবশ্যই

অনুধাবন করিবেন ইহা লক্ষ্য করিয়াছি, অল্প বয়স হইলেও রূপ থাকিলে মেয়েরা রাজনীতিক মহলে সহজেই অল্প সেবার বিনিময়ে বেশি খ্যাতিলাভ করিয়া থাকে।

সভার বিশদ বর্ণনা করিবার লোভ আমার নাই, উহা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ। তবে নিজেদের কথা আরও কিছু নিবেদন করিতে পারি। মঞ্চের উপরে কয়েকজন দেশবিখ্যাত রাজনীতিক ও বয়স্কা মহিলানেত্রী বসিয়াছিলেন। দেশের জন্য কারাবরণ, স্বার্থত্যাগ, উৎপীড়ন—ইহাদের সকলেই দীর্ঘকাল ধরিয়া সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সভাস্থ সকলে আমাদের লইয়া কানাকানি করিতেছিল। পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মেয়েদের সম্পর্কে কি ভাবে ও কোন্ ভাষায় আলাপ করে তাহা পুরুষ হইয়া না জন্মিলে বুঝা কঠিন। তবে তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা অসভ্য নয়, আমাদের ন্যায় যে তাহারা রুচি ও শ্লীলতা কথায় কথায় অতিক্রম করে না ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারি। অর্থাৎ, লোকে আমার যত নিন্দাই করুক, সুবিধা পাইলেই আমি ছেলেদের প্রশংসা করিব। কি জানি কেন, ছেলেদের অন্যায়টা কোনোদিন আমার চোখে পড়ে না। ইহা দেখিয়াছি মেয়েমহলে আলাপ করিতে বসিলে আমি সহজেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হই, কিন্তু ছেলেদের মাঝখানে?—ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব করিয়া অশেষ আনন্দে কাটাইয়া দিতে পারি।

বক্তৃতা করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় শিবরাণীকে আহ্বান

করিলেন। শিবরাণীকে অবশ্য হাততালির ভিতর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল, কিন্তু তাঁহার ভঙ্গীটি যেন অনেকটা লজ্জানম্রা গৃহস্থ-বধূর ন্যায়। বাণী উচ্চারণ করিতে গিয়া তিনি যেন কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি যখন প্রথম মুখ ফুটিয়া বলিলেন, সমবেত বন্ধু ও বান্ধবীগণ! সামান্য দু'একটি কথায় আমি আপনাদের নিকট আমার বক্তব্য নিবেদন করব!—তখন মনে হইল তিনি যেন এই কথা বলিতেছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে নামিয়া আমি অতিশয় ঝকমারি করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন, স্বামী পুত্র লইয়া নিভৃতে ঘরকন্না করিতেই আমার জন্ম, আমি তুলসীতলায় প্রদীপ দিব, রাঁধিব, গুরুজনের সেবা করিব। বাস্তবিক বলিতেছি, শিবরাণীর মতো মেয়েকে যদি বক্তৃতা করিয়া দেশস্বাধীন করিবার কাজে নামিতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশে পুরুষ নাই। স্বদেশসেবা সম্বন্ধে আমি মেয়েদের নিরুৎসাহ করিতেছি না, আমি বলিতেছি যোগ্যতা ও অধিকারের দিক হইতে। যাহার অধরে এমন স্নেহ-সুশীতল বাৎসল্যের হাসি, কণ্ঠস্বরে যাহার এমন করুণার মন্দাকিনীধারা, ব্যবহার ও আচরণে যাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির এমন অনির্বচনীয় মহিমা, তাহার স্থান আর যেখানেই হউক, ঝটিকা বিক্ষুব্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের রৌদ্রতপ্ত মরুভূমির উপরে নয়। শিবরাণীর হৃদয় আছে, যোগ্যতা নাই, প্রাণ আছে, কৌশল নাই; অধ্যবসায় আয়োজন আছে, আকুলতা আছে তাহা অপেক্ষাও অধিক, কিন্তু সংগঠন চাতুর্য একটি বিন্দুও নাই।

## ঘুমভাঙার রাত

শিবরাণী কি বকিয়া যাইতেছিলেন তাহা শুনিবার আগ্রহ আমার একটুও ছিল না। তিনি যাহা বলিবেন তাহা সকলেই জানে। যাহারা সত্য কথা বলে তাহাদের কথা অতি সহজবোধ্য, যাহারা মিথ্যা বলে তাহাদিগকেও অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু যাহারা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশাইয়া মনোহর ভাষায় বলে,তাহাদের কথায় আমি রস পাই। শিবরাণীর বক্তৃতায় রস পাই না। সে যাহা হউক, আমার লক্ষ্য ছিল অদূরে উপবিষ্ট নবেন্দুর প্রতি, শিবরাণীর বক্তৃতা তাহার মুখের উপর কেমন প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাই আড়চোখে নিবিষ্ট নয়নে দেখিতেছিলাম। এই বিরাট সভার ঠিক মধ্যস্থলে যে একটি মধুর প্রণয় কাহিনী আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ কি জানে? কেহ কি জানে একটি নিভৃত শতদল কেমন করিয়া সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে? এই সেদিন পর্যন্ত প্রণয় বস্তুটার সুস্পষ্ট চেহারা জানিতাম না, একখানা অতি আধুনিক অশ্লীল নভেল পড়িয়া উহার পরিচয়টা কদর্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল —মাত্র এই সেদিন। কিন্তু মাস কয়েক আগে কোনো এক রাত্রে প্রেসিডেন্সী জেলের অন্ধকার কক্ষে শিবরাণীর বুকের কাছে শুইয়া তাঁহাকে নবেন্দুর আলোচনায় যখন আবেগ-আতুর হইতে দেখিলাম, মনে হইতে লাগিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিকবিতা মূর্তি লইয়াছে। সেদিন কারাগারও ধন্য হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতে যাহা অবৈধ ও অন্যায় বলিয়া জানিতাম, তাহা যে এত সুন্দর, এমন পরমাশ্চর্য

রসবস্তু তাহার ভিতরে লুক্কায়িত থাকিতে পারে একথা কে ভাবিয়াছিল? সেই হইতে আজ অবধি নিত্যদিন ধরিয়া নীরবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, মাধুর্য রসের তরঙ্গে শিবরাণীর প্রাণপদ্মটি প্রাচুর্যের মধ্যে টলমল করিতেছে। নবেন্দুর হৃদয় কতখানি ঐশ্বর্যময় তাহা জানি না, কিন্তু একথা বিশ্বাস করি, নবেন্দুর ভবিষ্যৎ জীবন ধন্য হইবে।

কখন শিবরাণীর বক্তৃতা শেষ হইয়াছে জানি নাই, হাততালির শব্দে চমক ভাঙিল। এই সুলভ হাততালিটা কবে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইবে তাহাই ভাবি। কারণ, মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা, লয়লা-মজনুর অভিনয়, রয়েল জুবিলি সার্কাসের ক্লাউনের ডিগবাজি, পথের মোড়ে ডুগডুগি বাজাইয়া বানরের নাচ—সর্বত্রই এই একই হাততালি! হাততালির পরে যখন সভাপতি মহাশয় আমার নাম ঘোষণা করিলেন তখন পুনরায় দুঃশীল করতালিধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হইল। এবার হাততালির আওয়াজটা বড়, তাহার কারণ আমি শিবরাণীর অপেক্ষা বয়সে ছোট। আর চেহারা? আগামী কাল বাঙ্গালা দৈনিক পত্রে আমার বক্তৃতার স্তুতিবাদ পড়িলে সকলেই বুঝিয়া লইবে। ওই যে, গ্যাস বাতির কাছে নিজের অস্তিত্ব জানাইবার জন্য সেই রিপোর্টার ছোকরা আমার প্রতি বিলোল নয়ন বুলাইয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

চীৎকার করিতে সুরু করিলাম। মুখের সহিত আমার হাত

দুই থানাও চলে। আমি যে স্ত্রীলোক তাহাতে আর সংশয় নাই, বরং দর্শকগণের রসাবিষ্ট চক্ষু তাহা বারম্বার প্রমাণিত করে। কিন্তু হরিণীনয়না আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার মতো আমার দুইখানা নির্লজ্জ বাহু পেলব-লাবণ্যে কুণ্ঠিত নয়, তাহাদের দ্রুত সঞ্চালনা দেখিয়া নিজেই অনেক সময়ে সচকিত হইয়া ভাবিয়াছি, তরবারি ধরিতে না পারিয়া তাহারা যেন আক্ষেপ করিতেছে। আমার কণ্ঠস্বরে রসপ্রবাহিনী মন্দাকিনী নাই ; নবেন্দু বলেন, তোমার গলার ভিতরে আছে বিষ! আমি অনেক সময় অনুভব করিয়াছি, আমার মুখবিবরটা যেন একটা আগ্নেয়গিরিগহ্বর, ইহার ভিতর হইতে যাহা ঊর্ধ্বস্রোতে বাহির হয় তাহা ধ্বংসের কাজে লাগিতে পারে। দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ করিবার জন্য যেমন ছুঁচ ফুটাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তেমনি করিয়া বাঙ্গালা অভিধান হইতে বাছা বাছা শব্দ লইয়া উহাদের মনে গাঁথিয়া দিলাম। উহারা উত্তেজিত হইল, চীৎকার করিল, তিনবার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উড়াইল। ইহা দেখিয়াছি, নিজের বুকের যন্ত্রণা কঠিন করিয়া প্রকাশ করিলে উহাদের সহজে অভিভূত করা যায়।

সহসা নাটকীয় কৌশলে বক্তৃতা থামাইয়া বসিয়া পড়িলাম। ইহার পরেই সভায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সভাপতি মহাশয় এইবার উঠিয়া সকলকে স্থির হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বৃথা আমি তাহাদের মাথা খাইয়াছি—আর তাহারা ভদ্র, বিনয়ী, সংযম ও সুশীল ভাষা শুনিবে। তাহারা সারাদিনের পরে সন্ধ্যার

সময়ে একটু নেশা করিতে আসিয়াছিল, ভৃঙ্গারে ভরিয়া আমি তাহাদের সোমরস পান করাইয়াছি, মক্ষিরাণীর চক্র ছাড়িয়া এখন তাহারা দিকবিদিকে চলিয়া গেল। সভাপতি মহাশয় শূন্যসভায় দুই চারিটি মহামূল্য উপদেশ বিতরণ করিয়া সভার কার্য শেষ করিলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের দুইজনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলেজের ছাত্র ও নবনিযুক্ত কেরাণীর দল ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের অত্যাচারে নবেন্দু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। শিবরাণী চুপি চুপি বলিলেন, আজ ক'দিন থেকে ওর কি হয়েছে বল্ ত? এড়িয়ে চ'লে গেল কেন?

বলিলাম, বুদ্ধিমান ছেলে! পাঁচজনের মাঝখানে ধরা দিতে চায় না।

তিনি বলিলেন, আজ সকালে তোকে কি বলেছিল রে?

বলিলাম, বলছিলেন যে, শিবরাণী দেবীর মতো অকৃত্রিম দেশসেবিকা বহু যুগে একটি জন্মায়!

ঠাট্টা কেন ভাই? আমি না হয় তোর মতন ঝাঁঝাল বক্তৃতা দিই নি!

হাসিয়া বলিলাম, ওটা ত মুখোস, ও-কথায় আমাকে খোঁটা দিতে পারলে না। ওমা, এ কি রাণীদি, ভীড়ের জ্বালায় যে আব্রু থাকে না, শিগগির বেরিয়ে এসো।

দুইজনে বাহির হইয়া আসিলাম। শিবরাণী চারিদিক চাহিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া এত বিপদ-আপদের মধ্যেও তিনি আশা করিয়াছিলেন, নবেন্দুর সহিত একটিবার সাক্ষাৎ হইবে,

চাই কি সেদিনকার মতো ময়দানের নিভৃত কোনো প্রান্তে চন্দ্রালোকে বসিয়া নবেন্দুর সহিত রাজনীতির আলোচনা করিতে পারিবেন, জ্যোৎস্নালোকে নবেন্দু তাঁহার মুখখানিতে সকল কথার মাঝখানে একান্ত আত্মসমর্পণের বিহ্বল ছায়া লক্ষ্য করিবেন, কিন্তু সব মিথ্যা হইয়া গেল। তিনি করুণ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, একটিবার খুঁজে দেখবি ভাই ?

চোখ পাকাইয়া বলিলাম, রাণীদি, তুমি না লীডার ?

তিনি মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিলেন। আমি একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া তাঁহাকে তুলিলাম, নিজে উঠিয়া পাশে বসিলাম।

## সাত

প্রত্যাশা থাকিলেই দুঃখ আসিয়া ঘিরিয়া ধরে ইহা এতদিনে জানিতে পারিয়াছি। নবেন্দুকে আমি প্রথম হইতেই সহ্য করিতে পারিতাম না। তাহার হাসির ভিতরে অর্থ লক্ষ্য করিতাম, মাধুর্য পাইতাম না। তাহার রাজনীতি কার্যকলাপের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ কতখানি ছিল তাহার হিসাব আমরা করি নাই, কিন্তু শিবরাণীর চোখে যাহা এতদিন গোপন রহিল, আমি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছি। নবেন্দুর উচ্চাশা আছে অনেক কিন্তু কর্মপদ্ধতি কিছু নাই। নেতা হইবার বাসনা তাহার কম নয়, দেশকে স্বাধীন করিবার যে-আকাঙ্ক্ষা তাহার তীব্রতাও প্রচুর, কিন্তু দল গড়িয়া কোন্ কৌশলে যে কাজ করিতে হয় তাহা সে জানিত না।

ইহা রাজনীতির কথা, সুতরাং একথা থাক্।

স্ত্রীলোক হইয়া যে-বিড়ম্বনা শিবরাণীকে ভোগ করিতে হইল তাহাই বলিব। প্রত্যাশা থাকিলেই দুঃখ। কিছুকাল হইতে শিবরাণীর আগ্রহ যতটা বাড়িয়াছে, নবেন্দুর আগ্রহ ঠিক সেই পরিমাণে কমিয়াছে। শিবরাণী বাঙ্গালা দেশের মেয়ে, সুতরাং সহনশীলতা কম। তিনি হয় ত মনে মনে অনুভব করিয়াছেন এ দেশে দ্রুত ফুল ধরে, ফল পাকে এবং দ্রুত ঝরিয়া যায়, এই সময়টুকুর মধ্যে সব খেলা সারিয়া লইতে না পারিলেই জীবনটাই ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাটা চোখে পড়ে কুড়ি বছর বয়সের পর হইতে, অর্থাৎ পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ না হইলে মেয়েরা পুরুষবিদ্বেষী হইয়া ধর্মগ্রন্থাদিতে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করে।

যে-ঘটনাটার কথা বলিব তাহাতে যে কেবল শিবরাণীরই চোখ ফুটিল, তাহা নহে, আমারও ভুল ভাঙিল। আমি পূর্বে মনে করিতাম আমার পরম প্রিয়তমা শিবরাণীদিদি নবেন্দুর প্রতি প্রণয়াসক্তা; মনে করিবার কারণও ছিল, বন্ধুমহলে প্রণয়রীতির যে সকল লক্ষণ কানে শুনিয়াছি, সমস্তগুলিই শিবরাণীর ব্যবহারিক জীবনে বর্তমান—গোপন অশ্রু, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, আহারে অরুচি, রাত্রে বিনিদ্রা, কার্যে অনিচ্ছা, সহজে ক্লান্তি, স্মৃতিশক্তির হানি, মেজাজের রুক্ষতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখন দেখিতেছি সেই প্রণয়ের ভিতরে ছিল অন্য কথা। একটা বয়স থাকে, যেমন আমার—আমি সেই বয়স পার হইয়াছি বলিয়া মনে করি না—যখন বিচার

বিবেচনাহীন আসক্তি বর্ষার নদীর ন্যায় সকল কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলে, বুকের ভিতরকার সেই রক্তোচ্ছ্বাসকে গভীর প্রেম বলিয়া আমরা অভিহিত করিয়া থাকি, প্রেম শব্দটার এত বড় অপব্যবহার আর কোনও বয়সে ঘটে না তাহাও জানি, কিন্তু শিবরাণীর দিকে চাহিয়া দেখি তাঁহার অন্তত সেই বয়সটা নাই, ভুল করিবার অথবা ভুল বুঝিবার বয়সটাকে তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় অতি কোমল, ব্যবহার কোমলতর, কিন্তু যেখানে স্ত্রীলোকের হৃদয় লইয়া হিসাব নিকাশ, সেখানে আর সকল মেয়ের মতো তিনিও সজাগ, ভালোবাসা সম্পর্কে শতকরা নব্বইটি মেয়ের মতো প্রতারিত হইবার সুবিধা তাঁহার কাছে নাই।

গত রাত্রে সেই যে [illegible] হইতে বাসায় ফিরিয়া রাজনীতির চর্চা করিতে বসিয়াছিলাম, আজ সকালেও তাহার ধূয়াটা রহিয়া গেছে। দুইজনেই বারান্দার ধারে বসিয়া একখানা ইংরেজি দৈনিকের সংবাদ আলোচনা করিতেছিলাম। সমগ্র দেশে এখনও পূর্ণমাত্রায় ঝড় বহিতেছে, নেতাগণকে প্রতিদিনই গ্রেপ্তার করা হইতেছে, কারাগারগুলি ভরিয়া উঠিতেছে। আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলনের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিদিনই উদ্বেলিত হইতেছিল। দৈনিক পত্রটি তাহারই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে।

নিচে একখানা মোটর আসিয়া থামিল। শিবরাণী একজন বিখ্যাত নেত্রী সুতরাং তাঁহার বাড়ীর দরজায় সময়ে অসময়ে মোটর আসিয়া দাঁড়াইবে ইহাতে বৈচিত্র্য কিছু নাই। সম্প্রতি তাঁহার কাজও বাড়ি-

য়াছে ! বজবজে কোন্ এক চটকলে ধর্মঘট চলিতেছিল, সেখানে রাণী-দির যাইবার কথা ; জেলে প্রায়োপবেশন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার জন্য জনসভা করিতে হইবে ; পিকেটিংয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা পাঠানো দরকার —এই সকল কারণে অবিশ্রান্ত লোকজন এখানে আনাগোনা করে। কাগজখানা মুখের কাছে ধরিয়া আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

নিচে হইতে তেতালায় আসিবার পথটা অবারিত। সিঁড়িতে দুই জনের জুতার মসমস শব্দ শুনিতে পাইলাম। অন্দর মহলের ভিতরে আসিয়া ঢুকিলে রাজনীতিক খোলসটা আমাদের গা হইতে খসিয়া যায়, অর্থাৎ রংচঙে পোষাকী শাড়ীটা বাহির হইতে আসিয়া ছাড়িয়া ফেলি—আটপৌরে শাদামাঠা কাপড়খানা জড়াইয়া লই। সত্য বলিতে কি, কোনো মেয়েরই স্বভাবের সহিত রাজনীতিটা খাপ খায় নাই। কিন্তু জুতার শব্দ পাইয়া আমরা পরিত্যক্ত মুখোসটা আবার তুলিয়া মুখে পরিলাম। নেত্রীর ভঙ্গীতে ভব্য হইয়া বসিলাম। দেশের হিতচিন্তায় দূরের দিকে আমাদের দৃষ্টি স্তিমিত, মহান্ আদর্শবাদ আমাদের মুখের চারিদিকে একটি জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা চিরব্রহ্মচারিণী, সর্বত্যাগিনী ; দেশের কর্ম ছাড়া অন্য চিন্তা নাই, পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর কল্যাণকামনা করিতে করিতে আমাদের ভাতে অরুচি ধরিয়াছে।

গলার সাড়া পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, নবেন্দু। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নবেন্দুর সহিত আর একটি যুবক আসিয়াছেন। নবেন্দু বলিলেন, তাড়াতাড়ি আসতে হোলো বিশেষ কাজে।

শিবরাণী মৃদুহাস্য করিলেন। বলিলেন, কাজ নিয়েই ত সবাই আসে।

কথাটাকে আমল না দিয়া নবেন্দু বলিলেন, এঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি স্টুডেন্টস্ ওয়ার কাউন্সিলের ডিক্টেটর। নাম বিজয় বসু। বেশি দেরি নেই, শীঘ্রই গ্রেপ্তার হবেন ভরসা আছে।

আমরা সকলে সহাস্যে নমস্কার বিনিময় করিলাম। বিজয় বলিলেন, কাল আপনাদের দুজনের বক্তৃতার সম্পূর্ণ রিপোর্ট কাগজে বেরিয়েছে, দেখেছেন? মুখের ওপর প্রশংসা করতে লজ্জা করে, শুধু এই কথা বলতে পারি যে, ভালো বক্তৃতা ব'লেই ওরা বরদাস্ত করতে পারবে না, আপনাদের জব্দ করবার চেষ্টা পাবে।

পুরুষের মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া মনে মনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম। প্রথমটা বিনয় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সুবিধা হইল না। ভাবিলাম বন্ধুটিকে এক পেয়ালা চা খাইতে অনুরোধ করি কিন্তু মনের খুশিটা পাছে তাহাতেও ধরা পড়িয়া যায় এজন্য চুপ করিয়া গেলাম। সংবাদপত্রের সহস্র স্তুতিবাদে গ্রাহ্য করি না কিন্তু বিজয়ের ন্যায় একটি যুবকও যদি কাছে আসিয়া হাসিমুখে সুখ্যাতি করে তাহাতেই গলিয়া যাই। কি কথা বলিলে মানায় তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; ওদিকে শিবরাণীর ভিতরে যে ঝড় বহিতেছিল তাহাও আমার চক্ষু এড়াইল না। ইহারা চলিয়া গেলে আমি যে রাণীদির নিকট হইতে সন্দেশ আদায় করিব তাহাতে আর ভুল নাই।

# ঘুমভাঙার রাত

বলিলাম, নবেন্দুবাবু, কাল রাত্রে আপনি কোথায় পালালেন, বলুন ত ?

নবেন্দু বলিলেন, তুমি খুঁজেছিলে নাকি ?

শুধু খোঁজা ? না দেখতে পেয়ে একেবারে অন্ধকার দেখছিলুম।

বিজয় হাসিলেন। আমি কটাক্ষে রাণীদিকে দেখিয়া লইলাম। নবেন্দু হাসিমুখে পুনরায় বলিলেন, কান্নাকাটি করো নি ?

আমি দমিবার পাত্রী নহি। বলিলাম, নিশ্চয়, একেবারে ঝরঝরিয়ে চোখের জল, বৃন্দাবন থেকে মথুরা পর্যন্ত রাস্তাটায় জল দাঁড়িয়ে গেল !

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। নবেন্দু বলিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর ফিরবেন না !—শোনো যমুনা, কথা আছে। এই বলিয়া তিনি উঠিলেন, আমি তাঁহার পিছনে পিছনে গেলাম। বাহিরে বিজয় ও শিবরাণী বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

আড়ালে আসিয়া আমি নিজমূর্তি ধরিলাম। প্রথমে ক্রুদ্ধকণ্ঠে একখানা চেয়ার দেখাইয়া মিশ্রিত ভাষায় বলিলাম, ওই চেয়ারে সিট ডাউন।

নবেন্দু বসিলেন। বলিলাম, ভেবেছেন কি আপনি ? শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আর ফিরবেন না বটে কিন্তু শ্রীরাধাকে তিনি ধাপ্পা দিয়ে যাননি।

তিনি খপ করিয়া আমার একখানা হাত ধরিলেন। বলিলাম, ছাড়ুন বলছি নৈলে পুলিশ ডাকবো। এখনো ইংরেজ রাজত্ব আছে, এখনো সুবিচার আছে !

হাত নবেন্দু ছাড়িলেন না। বলিলেন, পুলিশ ডাকো, চেঁচাও,

কিন্তু হাত ছাড়বো না। সত্যি, রাগ করো না, তোমার জন্যে পাত্র ধ'রে এনেছি।

হাসিয়া বলিলাম, আপনার ওই বিজয় নাকি ?

মন্দ কি ?

রাম বলো! আপনাদের সঙ্গে বরং প্রণয় করা যায়, বিয়ে করা যায় না।

কারণ।

ভরসা কিছু নেই। বেহিসেবি আপনারা। শেষকালে কি ঘর আগলে ব'সে কাঁদবো ? ওর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভালো।

নবেন্দু বলিলেন, দেশের জন্যে মহান্ আত্মত্যাগ কি তোমার পছন্দ নয় ?

বলিলাম, শুনতে ভালো, কিন্তু মনে রাখবেন, পুরুষকে বাঁধতে না পারলে সুখ নেই।

নবেন্দু আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিলে . পরে বলিলেন, আমাকে কেউ বেঁধেছে একথা যদি শোনে

আপনার কথার মানে কি ?

তিনি একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, সেই খবরটাই দিতে এসেছি তোমাদের, আশা করি আমাকে ভুল বুঝবে না।

চকিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়াছি। নবেন্দু বলিলেন, কাল সমস্ত দিন আমি হাসপাতাল আর পুলিশের থানায় ছুটোছুটি করেছি। অশ্রুকে আদালতে আর যেতে হবে না।

মানে ?

মানে, ব্যাপারটা মিটে গেছে। অশ্রুমতীর সব ভার আমি নিয়েছি, শিবরাণীকে এই কথাটা তুমি জানিয়ো।

আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে নবেন্দুর দিকে চাহিয়া রহিলাম। নবেন্দু বলিতে লাগিলেন, যে কথাটা এতদিন জানাতে পারি নি সেই কথাটাই তোমাদের বল্‌ব। অশ্রুমতীর সব লাঞ্ছনা আমারই জন্যে, আমারই জন্যে ও ছেড়ে এসেছিল সব। আজ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা আমারই কর্তব্য।

আপনি এ কথা এতদিন প্রকাশ করেন নি কেন ?

মনে করেছিলুম শিবরাণী নিজেই সব বুঝবেন। তুমি জানো যমুনা, অপরাধ আমার দিক থেকে কিছু ঘটে নি।

ইহার পরে যে কোনো আলোচনাই অবান্তর এবং সত্য বলিতে কি, ঘৃণ্য। তবু একবার বলিয়া ফেলিলাম, আপনি একটা ভয়ানক প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, তা জানেন ?

নিজের ব্যবহারের দ্বারা দিই নি, যমুনা।

না, তার চেয়েও আপনি ভয়ানক, আপনি চুপ করেছিলেন। —আমার কান্না আসিতেছিল, কিন্তু তাহা প্রাণপণে চাপিয়া বলিলাম, আমি ওকে ডাকি, আপনি নিজের মুখে সব ব'লে যান্।

নবেন্দু বলিল, দাঁড়াও, ওটা আর আমাকে করতে বলো না, আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাও, যমুনা।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, অশ্রু কোথায় ?

নতুন বাসা ক'রে তাকে কাল রাত্রে নিয়ে গেছি। একজন ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে সে আছে।

আপনি বিয়ে করবেন তাকে ?

করবার আয়োজন করেছি। তার আগে তোমাদের সম্মতি নিতে এলাম।

আমি বলিলাম, সম্মতি আমার নেই, তবে রাণীদির আছে, জানবেন। আপনি ওদিক দিয়ে আর যাবেন না, এই দরজা দিয়ে নিচে নেমে যান্, আমি আপনার বন্ধুকে ডেকে দিচ্ছি।—এই বলিয়া আমি বাহির হইয়া আসিলাম।

দুইজনে বসিয়া গল্প করিতেছিল, আমি উপস্থিত সমস্ত সৌজন্য ও সামাজিকতা ভুলিয়া বলিলাম, বিজয়বাবু, নিচে আপনার বন্ধু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ও, তাই নাকি ? আচ্ছা, আজ তবে উঠলাম।—এই বলিয়া বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইল, আমাদের দুইজনকে নমস্কার জানাইল এবং আবার আসিব বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেল।

বলিলাম, কা'র চিঠি তোমার হাতে, রাণীদি ?

শিবরাণী বলিলেন, সন্তোষ দত্তর চিঠি, এইমাত্র পিওন দিয়ে গেল।

বিস্মিত আনন্দে বলিলাম, বেঁচে আছে সন্তোষ দত্ত ? কোথায় আছে ?

আয় না পড়ি দুজনে। রাজসাহীর দিকে এখন আছে।

এতদিন রাজবন্দী ছিল, এখন ছাড়া পেয়েছে। সন্তোষ ত তোর একজন ভক্ত রে যমুনা?

আমার? নাকে দড়ি দিয়ে তুমি তাকে খাটিয়ে নিলে, মুখ বুজে সে তোমার হুকুম পালন ক'রে চললো, তোমার সম্বর্ধনা সভায় গান গেয়ে তার হোলো জেল, চিঠিপত্রও তোমার সঙ্গে—তবু আমার ভক্ত সে হোলো কেমন ক'রে?

শিবরাণী বলিলেন, আমাকে হয় ত মান্য করে, কিন্তু তোকে যে ভালোবাসে রে মুখপুড়ি!

পুরুষের ভালোবাসা।—বলিলাম, পদ্ম[illegible]নীর! যোগ্যতার বিচার নেই, অযোগ্যতার বিবেচনা নেই। ঝড়ের মতন আসে বানের মতন চ'লে যায়। থাক, ও কথা আর আমাকে শুনিয়ো না রাণীদি। হৃদয়হীন দুর্দান্ত খেলায় ওরা রস পায়, দুঃখ দিয়ে ওদের আনন্দ!—বলিতে বলিতে আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শিবরাণী কাছে আসিলেন, আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, উত্তেজনা কেন রে? কি ব'লে গেল?

রাণীদিকে আমি ভালোবাসিয়াছিলাম। নবেন্দু এমনি করিয়া বিদায় লইল, ইহাতে আমার কোনো ক্ষতি হয় নাই। যে-বিশ্বাস ও নির্ভরতার গোড়ায় সে বিষ ঢালিয়া গেল তাহাতে আমার স্বার্থের কোনোরূপ হানি হইবে না, আমি নবেন্দুকে প্রথম হইতেই কেমন একটা সন্দেহ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু রাণীদিকে বুঝাইব কেমন করিয়া? কেমন করিয়া জানাইব যে, তোমার প্রতি এই

নির্দয় অবহেলা আমাকে মর্মান্তিক আঘাত করিয়াছে, তোমার প্রতি এই শোচনীয় নিষ্ঠুরতা আমার বুকের উপর দিয়াও রথচক্র চালাইয়া গেছে।

রাণীদি বলিলেন, আবার আসবে ব'লে গেল নাকি ?

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আর কোনোদিন আসবে না, আমি মানা ক'রে দিয়েছি।

রাণীদি আরো কোনো প্রশ্ন করিতেছিলেন, কিন্তু নিচে অনেক লোকের গোলমাল শুনিয়া তিনি তটস্থ হইয়া উঠিলেন। আমিও মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম। দেখিলাম রাস্তার উপর আমাদেরই বাড়ীর সম্মুখে কয়েকটা লাল-পাগড়ি পাহারাওয়ালা এদিক ওদিক চাহিতেছে। শাদা পোষাক পরা কয়েকজন সার্জেণ্ট ও গোয়েন্দা বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। বুঝিলাম, সময় আসন্ন।

দুইজন ইন্‌স্‌পেক্টর ও জনতিনেক সার্জেণ্ট ও জমাদার উপরে উঠিয়া আসিলেন। আমাদের দুইজনের দিকে চাহিয়া বাঙালী ইন্‌স্‌পেক্টর নমস্কার করিয়া বলিলেন, যমুনা দেবী !

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, কাল রাত্রে আপনার বক্তৃতাটা একটু বেশি মাত্রা ডিঙিয়ে গিয়েছিল।

শিবরাণী প্রশ্ন করিলেন, ওয়ারেণ্ট কই ?

এই যে।—বলিয়া তিনি কাগজপত্র বাহির করিলেন।

আমি ভাবিতেছিলাম, কাল রাত্রের বক্তৃতাটা! সে ত গত রাত্রির। তাহার পরে আমার মত ও পথ কত যে বদলাইয়াছে

তাহা কি ইহারা জানে না? গত রাত্রির মানুষ ত আমি নই, কী যে বলিয়াছি তাহাও ত স্মরণ করিতে পারি না! কাল ভাবিয়াছিলাম দেশকে স্বাধীন করিব, আজ সকালে ভাবিতেছি, যে-দেশের পুরুষ নিরপরাধ নারীর বুক এমন করিয়া ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশ পরাধীন থাকুক চিরদিন! চিরদিন ধরিয়া সাম্রাজ্য-বাদীর লাথি খাইয়া মানুষ হইয়া উঠুক। এই কথা ভাবিতেছিলাম, রাণীদিকে লইয়া কোনো তীর্থপথে চলিয়া যাই, অপমান আর বেদনা, নিষ্ঠুরতা আর বিশ্বাসঘাতকতা হইতে দূরে কোনো নিভৃত পৃথিবীর এক কোণে গিয়া আমরা অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিই।

রাণীদি বলিলেন, আমার নামেও ওয়ারেণ্ট আছে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার সেই বজবজের চটকলের বক্তৃতাটা—

হঠাৎ খুশি হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, বাঁচালেন আপনারা, আপনাদের জন্যে এই ফাল্গুনে পথ চেয়ে আর কাল গুণে দিন কাটছিল। কিন্তু এখনো আমরা চা খাই নি, শ্বশুরবাড়ীতে জলযোগের বন্দোবস্ত আছে ত?

রাণীদি হাসিয়া উঠিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। ওদিকে বাঙালী ইন্‌স্পেক্টর বাবুটি লজ্জায় নতমুখে মুখ রাঙা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

বলিলাম, সাজগোছের সময় দেবেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আধঘণ্টাখানেক—

গাড়ী এনেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাণীদি বলিলেন, থানাতল্লাসীর পরোয়ানা আছে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরাই সব খুলে দেখাবো, না আপনারা খুলবেন।

তিনি বলিলেন, আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।—এই বলিয়া তাঁহারা দুইজন আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন, দুইজন আমাদের নজরবন্দী করিল।

আমরা গ্রেপ্তার হইয়া বাঁচিলাম।

নিচে পল্লী প্রতিবাসী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের শ্বশুরবাড়ী যাইতে দেখিয়া অনেকেই কোঁচার খুঁটে ও আঁচলে চক্ষু মুছিল। আমরা হাসিমুখে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। জেলে গিয়া আমরা যে নিশ্চিন্তে আহার ও বিশ্রাম পাইব একথা তাহারা ভাবিয়া দেখিল না। দেশের কাজ করিবার বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইয়া আমরা যে কিছুকাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব ইহাও তাহাদের চোখে পড়িল না।

গাড়ী যখন চলিতে লাগিল তখন রাণীদি পুনরায় চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, কই, নবেন্দুর কথা কিছু বললি নে যমুনা?

বলিলাম, কী শুনতে চাও তুমি?

ও কি জান্‌তো যে আমরা গ্রেপ্তার হবো, তাই দেখা করতে এসেছিল?

না, এসেছিল তোমার বুকে ছুরি বসাতে।

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। [illegible]র ভূমিকা না করিয়াই বলিলাম, তোমাকে কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়েছে নবেন্দু, এজন্য কৃতজ্ঞ থেকো। অশ্রুকে আর আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না, নবেন্দু তার সম্মান বাঁচিয়েছে, তার সঙ্গে তোমার মহিলা আশ্রমকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে।

তার মানে কি যমুনা?

তার মানে অশ্রুকে নবেন্দুবাবু বিয়ে করবেন। অশ্রু গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল তারই জন্যে, এখন আর অশ্রুর কোনো কলঙ্ক নেই।

দেখিতে দেখিতে ঘৃণায় শিবরাণীর সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি স্তব্ধ হইয়া দ্রুতগতিশীল মোটরের বাহিরে দূরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে করিয়াছিলাম রাণীদি ভাঙিয়া পড়িবেন, কিন্তু যে-অমিতশক্তি তাঁহার স্বভাবের কোমল লাবণ্যকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীনতার আদর্শবাদকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিয়াছে, সেই শক্তির সুদৃঢ় কাঠিন্য তাঁহার মুখে চোখে উদ্ভাসিত হইতে দেখিলাম। মনে হইল, ইনি রাণীদি নন্, ইনি নেত্রী শিবরাণী! ইঁহার চোখের ভিতরে সেই অগ্নির আভা, যাহা বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, অন্যায় ও অবিচারকে অস্বীকার করে, দুর্বলকে সবল করিবার চেষ্টা পায়, কাপুরুষতাকে ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয়। এক সময় আবার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে তিনি মুখ ফিরাইলেন, স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, মানুষ নয়, নরপশু!

## আট

আমার ছয় মাস ও রাণীদির চার মাস। অর্থাৎ এই কথাটা বুঝিলাম, কিছুকাল আমাদের আটকাইয়া না রাখিলে আর কর্তৃপক্ষের চলিতেছে না। আপীল করিলে হয়ত রাণীদি খালাস পাইতেন, কিন্তু আপীল করিব ইংরাজের আদালতে? প্রাণ গেলেও না, রক্তে এখনও আমাদের নুন আছে, চিনি জমে নাই!

জনশ্রুতি এই, আমরা নাকি চরমপন্থী, স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ঘুমাইব না, ছলে-বলে-কৌশলে স্বরাজ আমাদের চাই। কিন্তু স্বরাজ পাইবার পরে কি করিব? সংসারে নবেন্দুরা চিরদিন ধরিয়াই আছে, সম্ভবতঃ চিরদিনই থাকিবে। একথা কাহাকে বুঝাইব, স্বরাজের অপেক্ষা সুখটাই আমাদের কাছে বড়; রাজনীতির সমস্যা অপেক্ষা হৃদয়-সমস্যাই আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। হায়, মেয়েনেত্রীর হৃদয় বুঝিবার মানুষ কেহ নাই।

কারাগারে আসিয়া আবদ্ধ হইলাম তাহা জানি, কিছুদিন বিশ্রাম পাইলাম, আনন্দিত হইলাম। এক এক সময়ে কারাগারে না আসিতে পারিলে সম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে, লোকে আমাদের দেশপ্রীতির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে থাকে। দেশের সেবা করা ভিন্ন তখন আর আমাদের গত্যন্তর নাই, অর্থাৎ কাজের স্রোত কমিয়া আসিলে শাস্তি লইয়া জেলে আসিয়া

ঢুকিলেই সব দিক রক্ষা হয়। আমরা দেশের সেবা করিতে নামিয়া বিপদে পড়িয়াছি ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ পাইলে লোকে কদর্য পরিহাস করিবে, কোনও যুবকের সহিত বার দুই পথে আনাগোনা করিতে দেখিলে কলঙ্ক রটিতে বিলম্ব হইবে না, ময়দানে গিয়া একটু বায়ুসেবন করিবার অধিকার নাই, ভালো খাইলে ও পরিলে নিন্দা হইবে, সিনেমা ও সার্কাসে আমাদের দেখিলে ত আর রক্ষা নাই, এক মুহূর্তেই আমাদের নেত্রীপনা ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। অতএব হে দেশমাতৃকা, অনেক হইয়াছে, এইবার তুমি আমাদের ছাড়িয়া দাও, আমরা নির্জনে গিয়া কাঁদিয়া বাঁচি। এই ত কুড়ির পরে বুড়ি হইতে চলিলাম, বসন্ত যে বিদায় লইতেছে, আর কবে কি করিব, মা? তোমার হাতের মালা ফাঁসী হইয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, এবার একটু আল্‌গা দাও, কিছু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

এই লইয়া তিনবার জেলে আসিলাম। একই কারণে তিনবার। কারণটা কি তাহা স্পষ্ট নয়। উত্তেজনাবশতঃ দুই চারিটা গরম গরম কথা বলিয়া ফেলি, তাহাতেই এই কেলেঙ্কারী। চারিদিকে যখন ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়, নিজের মনে তখন প্রশ্ন করি, কোন্‌ কথায় এমন অঘটন ঘটিল! আশ্চর্য, কোনো কথাই মনে পড়ে না, পরিষ্কার সব ভুলিয়া গিয়াছি। ইংরাজ রাজত্ব ঠিক তেমনিই আছে, একখানি ইঁটও তাহার খসাইতে পারি নাই, মাঝে হইতে মেয়েমানুষ লইয়া এই লাঞ্ছনা। জেলে বসিয়া মেয়েদের দেখিতেছি,

## ঘুমভাঙার রাত

দেশের সম্বন্ধে কাহারও কোনও উদ্বেগ নাই। কেহ স্বামী ও দেবরের গল্প লইয়া মশগুল হইয়া আছে, কেহ চুলের কাঁটা ও চিরুণী লইয়া কলহ করিতেছে, কেহ কোলের ছেলেটার কথা ভাবিয়া কাঁদিতে বসিয়াছে, কেহ শাড়ী ও সেমিজের সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া আছে। কুমারীদের মুখে দেশনেতা ও নেত্রীগণকে লইয়া পরিহাসের গল্প শোনা যায়, বিবাহিতারা কবে 'ইন্‌টারভ্যু' পাইবে তাহারই আশায় দিন দিন গণিতেছে, বিধবারা তাহাদের হবিষ্যান্নের আয়োজনের সহিত এই উভয় দলের গোপন সমালোচনা ও কুৎসা লইয়া ব্যস্ত। আর একদল আছেন তাঁহারা অধিক বয়স্কা কুমারী, তাঁহারা আরও কোনও দিন ঘর-সংসার করিবার আশা রাখেন না, তাঁহারা 'কন্‌ভিক্‌ট্‌' দাসী ও ঝাড়ুদারনিগণের সহিত নানারূপ হাসিতামাসা করিয়া সময় অতিবাহিত করেন! তাঁহাদের দেখিলে ভয় করে, তাঁহাদের বেপরোয়া কথাবার্তা, বেপরোয়া চালচলন। মেয়েরা যখন সংসার ও ভোগজীবন সম্বন্ধে হতাশ হয় তখন তাহাদের মনে একরূপ বিপ্লবাত্মক মনোভাব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, অনুকূল বাতাসে তাহা দেখিতে দেখিতে জ্বলিয়া ওঠে। একই উত্তেজনামূলক শক্তির বিভিন্ন চেহারা দেখা যায়। হাতের কাছে জাতীয় আন্দোলন ছিল তাহাতেই ইহারা ঝাঁপ দিয়াছে; তাহা না হইলে ইহারা সমাজ-বিদ্রোহিনী হইয়া ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইতে পারিত; কিছু না হউক, দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেও ইহারা কুণ্ঠাবোধ করিত না।

## ঘুমভাঙার রাত

দেশমাতৃকা এই সকল মেয়েদের আহ্বান করিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু সরোজিনী-প্রমীলা-রেখা-আনন্দময়ীদের ডাকেন নাই তাহা আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি। ইহারা প্রচলিত সমাজ বিধির এক একটি প্রতিবাদ মাত্র। দেবরের সংসারে রান্না করিয়া কাহারও বৈধব্য অবস্থা কাটিতেছিল, কেহ ভাইয়ের স্ত্রী ও সন্তানের দাসীবৃত্তি করিয়া জর্জরিত, কেহ স্বামীর স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদ করিয়াছে, কেহ আসিয়াছে চরিত্র কলঙ্ক গোপন করিবার জন্য, কেহ স্বামীর পরিত্যক্ত, কেহ আসিয়াছে পিতাকে বরপণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, কেহ পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত বিবাদ করিয়া রাজনীতি করিয়াছে। ইহাদের সহিত আমরা কয়েকজন মেয়ে আছি। সত্য বলিব, আমরা ছিলাম বেকার। কেহ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কারাগারের রোমান্সে ভুলিয়াছি, কাহারও 'জোয়ান অব আর্ক' হইয়া উঠিবার বাসনা আছে, কেহ আশা করিয়াছিল ছেলেদের নিকট হাততালি পাইবে, কেহ সংবাদপত্রের প্রশস্তি পাইবে, কাহারও লোভ ছিল জীবন-বৈচিত্র্যের দিকে, কাহারও মনে ছিল ভয়ানক হুজুগ ও নেশা—মোটকথা, নেতারা আমাদিগকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করিয়াছেন। আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় কাহারও দেখি না, স্বাধীনতা কেন চাহি এবং পাইলে তাহা লইয়া কি করিব ইহা লইয়া কাহাকেও আলোচনা করিতে দেখি না। আমরা যে কারাগারে আছি ইহাও তেমন আমাদিগকে পীড়িত করে না, কারণ শ্বশুরবাড়ীতে বন্দিনী

হইয়া থাকিবার অভ্যাস অনেকেরই আছে—আমরা যেন অনেকটা বায়ুপরিবর্তন করিতে আসিয়াছি, সময় ফুরাইলে চলিয়া যাইব।

সশ্রম কারাবাস বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু 'স্বদেশী-ওয়ালীদের' দ্বারা পরিশ্রম করানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। বড় জোর ডাল ভাঙিতাম অথবা তকলিতে সুতা কাটিতাম, কিন্তু আর কিছু নয়। কাপড় সিদ্ধ করা, রাঁধিবার আয়োজন করা, বাসন মাজা ইহাও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু মেয়েরা দাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কাজ করিতে তাহাদের কুণ্ঠা নাই। আমি 'খ' শ্রেণীতে থাকিয়া যেদিন বেশি কাজ করিতাম, সেদিন 'ক' শ্রেণীর কোনো কোনো মেয়ে আমাকে ভালো খাবার পাঠাইয়া দিত। এমনি করিয়া আমরা আনন্দেই কাটাইতাম।

তিন মাস কাটিয়া গেল। বসন্তকাল আসিয়াছে। প্রাচীর পার হইয়া বাহিরের দিকে বিশেষ কিছু দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু ইহা অনুভব করিতাম বাহিরের সংসার আমাদের অভাবেও তেমনি করিয়া চলিতেছে। আমাদের কথা কেহই ভাবিতেছে না ইহা মনে হইলে এক একবার প্রাণের ভিতরটা আকুল হইয়া উঠিত, কেবল তখনই মনে হইত আমরা বন্দী, আমাদের স্বাধীনতা নাই। বাহিরে থাকিয়া ভাবিতাম, জেলে যাইতে পারিলে নির্বিঘ্ন বিশ্রাম পাইয়া বাঁচিব, কিন্তু জেলে আসিয়াই মনে হয় বাহিরেই

সুখ, বাহিরেই আনন্দ। অথচ বাহিরের [illegible]নের স্বাদ ত কিছু নাই, বাহিরের অবারিত মুক্তির গুরুভার [illegible]হিয়া বহিয়া কেমন করিয়াই বা দিন কাটিবে! গ্রামের কথা মনে হইল। ভৈরবের কূলে বসিয়া সারাদিন মাছধরা নৌকা গণিতাম, সন্ধ্যার সময় জামরুল তলায় বসিয়া আকাশের তারা গণিতাম। যাত্রী স্টিমার যখন বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া যাইত, মন ছুটিত তাহার পিছু পিছু, তাহার সহিত আমার বালিকা-মন ছুটিত নিরুদ্দেশের দিকে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চুপি চুপি বাহির হইয়া নদীর ঘাটে আসিতাম, সজিনার ডালে কাপড়খানা রাখিয়া নদীতে সাঁতার দিতে নামিতাম। একা—একা কাটাইয়াছি বাল্যকাল। সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল না, নিজেকে লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতাম। সৃষ্টির রহস্যবিস্ময় ছিল চোখে, নিজেকে প্রশ্ন করিতাম, আর আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার অর্থ ও উত্তর খুঁজিতাম। ভাবিতাম, আমি পুরুষ হইলাম না কেন! কিন্তু দেখিতে দেখিতে অকালে আমার সর্বাঙ্গে বসন্তকাল আসিয়া দেখা দিল। ফুল ফুটিয়া উঠিল স্তবকে স্তবকে। নিজের দিকে চাহিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠিলাম। গোপনে গোপনে কাঁদিয়া বেড়াইলাম।

সেই বসন্ত আসিয়াছে বারে বারে। দুঃখে ডুবিয়াছি, বিপদ মাথায় লইয়াছি, একাকিনী শহরে আসিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, আর একদিকে থাকিয়া থাকিয়া অশোক-শিমুল-কৃষ্ণচূড়ায় আগুন ধরিয়াছে, রক্তোৎসবে প্রকৃতি মাতিয়া উঠিয়াছে।

## ঘুমভাঙার রাত

আজ সম্মুখের বসন্তকালের দিকে চাহিয়া কেন জানি না চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। ইহার অর্থ নাই, হেতু নাই, কৈফিয়ৎ নাই, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, যে-জীবন যাপন করিতেছি তাহা একান্তই মিথ্যা, কোথায় একটা পিপাসা চাপা থাকিয়া যাইতেছে, নিজের কাছে যেন ধরা পড়িয়া যাইতেছি।

একদিন শিবরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, এবারে বেরিয়ে কি করা যাবে, বলো ত রাণীদি?

শিবরাণী আমার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, কাজের দিকে কি তোর আর মন নেই?

বলিলাম, কাজ কি আছে কিছু, রাণীদি?

অনেক, অনেক কাজ। আন্দোলনটা কাজ নয়, ওটা সঞ্চিত শক্তির পরিচয়। এইবারের মুভমেণ্ট্ থেমে এলো, এখন সত্যিকার দেশের কাজ আরম্ভ।

বলিলাম, কিন্তু কাজে আনন্দ নেই কেন, রাণীদি?

আমার এই প্রশ্নটা অবান্তর তাহা জানিতাম। আনন্দের পথটা বিচিত্র। কখন্ তাহা থাকে আর কখন্ তাহা থাকে না তাহা বুঝানো যেমন কঠিন, বুঝিবার চেষ্টা করাও তেমনি শক্ত। অন্তরের প্রয়োজনীয় খাদ্য হইতেই আনন্দের জন্ম ইহা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সব কিছু খাদ্য ও উপকরণ পাইয়াও পরিতৃপ্তি যাহার হয় নাই, অভীপ্সা যাহার চিরদিন

অপার্থিব কল্পনার পথ ধরিয়া চলে, এমন মানুষকে দেখিয়াছি। আমি কি চাই তাহা জানিতে পারিলে রাণীদিকে বলিতাম, এতটুকু সঙ্কোচ করিতাম না।

রাণীদি বলিলেন, বিয়ে করবি ?

মুখে আমার হাসি ফুটিল। বলিলাম, চেহারাটা বিয়ে করার অনুকূল বটে, তুমি কি শেষকালে আমাকে এই ওষুধ দিয়ে অসুখ সারাতে চাও ? দেখলে ত তুমি পুরুষমানুষের প্রকৃতি, এর পরেও রুচি থাকে ?

নবেন্দুর কথা স্মরণ করিয়া রাণীদির মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিতাম, ইহা অশ্রুমতীর প্রতি ঈর্ষা নয়, তিনি যে দীর্ঘ কয়েকমাস ধরিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, তাহারই জন্য একটা আত্মগ্লানি। নবেন্দুর কথা ঘুণাক্ষরেও উঠিলে শিবরাণী অধুনা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া থাকেন, একটা কথাও কিছু প্রকাশ করেন না। একথা জানিয়াছি ওদিকটার সম্বন্ধে অসীম বিতৃষ্ণায় তিনি বিমুখ।

এবারে আমি তাঁহার হাত ধরিলাম। বলিলাম, সন্তোষের চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি। তুমি তার ওখানে যাবে ?

শিবরাণী বলিলেন, সে না হয় গেলাম অল্পদিনের জন্য, কিন্তু কাজ ত একটা চাই, খরচপত্র চালাতে হবে। ও চাকরিটা কি আর পাবো ?

না পাও ক্ষতি নেই, কিছুকাল গ্রামে থাকি গে চলো। আমি সন্তোষকে দিয়ে একটা বন্দোবস্ত কর্‌তে পারবো।

শিবরাণী হাসিলেন। আমি বলিলাম, ঠাট্টা করবে এই ত? তা হোক, সন্তোষের টাকার ত আর অভাব নেই, এমন নয় যে তাকে আমরা পীড়ন করবো।

শিবরাণী আমাকে এতই অর্বাচীন বলিয়া ভাবিতেন যে, ঠাট্টা-তামাসা কিছুই করিতেন না। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমি থাকলে তোর হিংসে হবে না?

হাসিয়া বলিলাম, রাণীদি, হিংসে করবার মতন বিন্দুমাত্র সম্পর্কও তার সঙ্গে এখনো হয় নি।

তোকে ভালোবাসে না বলতে চাস?

স্তুতিটা ভালোবাসা নয়।

তিনি আমার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, কমল-কলি ফুটলো দেখছি। দিব্য জ্ঞান হোলো কবে থেকে?

ভিতরে থাকিয়া আমরা নানারূপ কল্পনা করিতাম কিন্তু বাহিরে গিয়া তাহা কি-রূপধারণ করিবে তাহা জানিতাম না। সন্তোষকে জানিতাম সে কোনোদিনই আমাদের অবহেলা করিতে পারিবে না, এক বৎসর আগে অবধি সে আমার প্রতি অনুরক্ত ছিল, সংবাদ না নেওয়া সত্ত্বেও আজ চিঠি দিয়াছে, কিন্তু চিঠির ভাষার সহিত ব্যবহারিক আদান প্রদান মিলিবে কিনা তাহা সঠিক বলিতে পারি না। শিবরাণীকে সাহস দিলাম বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা

সংশয় রহিয়া গেল। কমল-কলি আজ হয় ত ফুটিয়াছে কিন্তু সন্তোষের সহিত যতদিন মেলামেশা করিয়াছি, সেইসময় ফুটিয়াছিল কিনা তাহা লক্ষ্য করি নাই। ভালোবাসায় পড়িবার মতো বয়স আমার অবশ্যই হইয়াছিল, আকর্ষণ করিয়া আনিবার মতো চেহারাটাও ছিল সুস্পষ্ট এবং অন্যমনস্ক আমার আশপাশে কেহ কেহ যে গুন গুন করিয়া গেছে তাহাও যেন আজ অল্প অল্প স্মরণ করিতে পারি, তবে কিনা তখন একটু নির্বোধ ছিলাম, মন ছিল কিছু অপরিণত। অর্থাৎ, বাহির হইতে পাকাফলের রূপ দেখা যাইত, কিন্তু ভিতরে তখনও রসের মাধুর্য আসিয়া পৌছায় নাই।

রস আর মাধুর্যের কথা এখন থাক, পাকা রং ধরিবার সময় সন্তোষের সহিত আমার বন্ধুত্ব। তাহাকে আমি তুমি বলিতাম, নাম ধরিয়া ডাকিতাম। অথচ আন্দাজ করিতে পারি সে আমার চেয়ে ছয়-সাত বছরের বড়। বয়সে এত বড় হইলেও তাহার বালকত্ব এই সেদিনেও ঘুচে নাই। দেশের কাজে দুইজনে আশ্চর্য রকম মশগুল থাকিতাম, সম্ভব-অসম্ভব স্থানে দুইজনে বহুবার একত্র গিয়াছি, এবং সত্য কথা বলিব, শিবরাণী যেবার আমাদের দুই জনকে অত্যন্ত এক প্রয়োজনে বীরভূমে পাঠাইয়াছিলেন, সেইবার সাঁইথিয়া ষ্টেশনে ট্রেন ফেল করিয়াছিল বলিয়া সন্তোষকে আমি দুইটা চড়-চাপড় দিয়াছিলাম। উপন্যাসের নায়ক নায়িকা হইলে সন্তোষ সেদিন নতমস্তকে আমার হাতের চড় সহ্য করিয়া নভেলী কায়দায় প্রণয় নিবেদন করিত, কিন্তু সন্তোষের বালকত্ব সেদিন ঘুচে

নাই, অতএব বামহস্তে আমার কেশাকর্ষণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা সে আমাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়াছিল। পরের কথাটাও বলিয়া দিই। পরের ট্রেণে উঠিয়া আত্ম-গ্লানিতে অত বড় ছেলের কী কান্না তাহার এই ভয়, পাছে শিবরাণীকে এই ঘটনার কথা বলিয়া দিই!

আমি তাহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলাম, যদি তার আগে চড়ের দাগটা মিলিয়ে যায় তা হ'লে আর ব'লে দেবো না।

সন্তোষ আমাকে এক বাক্স চকোলেট্ কিনিয়া দিয়াছিল।

কিছুকাল পরে সন্তোষ অন্তরায়ণে চলিয়া গেল। কোথা হইতে কোথায় পুলিশ তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিল তাহা আর আমরা জানিতে পারিলাম না। অনেক ছেলে এবং মেয়ে এমনি করিয়া চক্ষুর আড়ালে চলিয়া গিয়াছে, দু' একদিন তাহাদের জন্য ভাবিয়াছি, দেশসেবার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ইহাই, এই মনে করিয়া অন্যত্র মনোযোগ দিয়াছি, সুতরাং সন্তোষের বিরহে বিধুর হইবার সময় পাই নাই। আমরা দুইজনেই দুইজনকে চিনিতাম এবং ভালোবাসিতাম, কিন্তু ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা ছিল না। ইহা ভাই-ভগ্নীর আনুগত্য, অথবা দাম্পত্য, অথবা সখ্য, অথবা অপরিণত প্রণয়, কিম্বা যাহাকে আধুনিক সমাজতন্ত্রী ভাষায় বলে, 'কমরেডশিপ'—ইহার কিছুই বুঝিতাম না। কেবল বুঝিতাম সন্তোষ আমাদের সমধর্মী, সে বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ কর্মী, বন্ধু এবং সর্বোপরি আত্মীয়। দেশসেবাকে সে সুবিধার পন্থা হিসাবে লইয়া

প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়ায় না। নবেন্দুর তুলনায় সন্তোষ দেবতা।

কবে সে বাহির হইয়াছে খোঁজ করি নাই, কী কাজে লিপ্ত তাহাও জানি না, তাহার মুক্তি সর্তাধীন কিনা তাহার সংবাদও আসে নাই—চিঠি পাইয়াই কেবল তাহার কথা মনে হইয়াছে। তাহার যে রূপ আছে, সাহসবিস্তৃত বলিষ্ঠ বক্ষপট আছে, মেয়েদের সহিত তাহার ব্যবহার যে শোভন,তাহার আচরণ যে মধুর, তাহাকে ভালোবাসিবার যে নানাবিধ কারণ আছে, ইহা আজ ওই অশ্বত্থগাছটার উপর দিয়া বসন্তের দক্ষিণ বাতাস বহিতে দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল। আগে কোনো কোনো মেয়ের নিকট এক আধবার সন্তোষের প্রসঙ্গ তুলিয়াছি যেন মনে পড়িল।

শিবরাণী কয়েকদিন 'রেমিশন্' পাইয়াছিলেন; চার মাস সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার হুকুম হইল। আগের দিন রাত্রে খবর দিয়া গেল—সমস্ত রাত জাগিয়া আমরা দুইজনে নানারূপ পরামর্শ করিলাম এবং তাঁহাকে সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলাম যে, আমি যদি কোনোদিন কোনো একটা বড় কাজের জন্ত অনুরোধ করি তবে তিনি অবহেলা করিবেন না।

## ঘুমভাঙার রাত

আমি যেন সেই রাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাঁহার কাছ হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিলাম। আমি শিবরাণীর বিবাহ দিব।

কারাকক্ষের অন্ধকারে রাত্রি ভরিয়া দুইজনে কাঁদিলাম। এই কান্নার অর্থ কি জানিতাম না, তবে ইহাই যেন বুঝিতেছিলাম, আমরা পরাধীন, হুকুমের ক্রীতদাসী, উদ্যত দণ্ড আমাদের দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। প্রকাণ্ড কক্ষের ভিতরে বহু মেয়ে শুইয়াছিল। ঘুমাইবার ভান করিয়া তখনও অনেকেই জাগ্রত। কেহ উসখুস করিতেছে, কেহ বা উঠিয়া ঘরের মধ্যে বার দুই পাক খাইয়া শান্ত হইয়া আবার শুইতেছে; কেহ আত্মনিগ্রহের যন্ত্রণায় এক একবার কেমন শব্দ করিয়া উঠিতেছে, আবার কোথাও আন্দাজ করা যায়, দুইজন পাশাপাশি শুইয়া ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতেছে।

## নয়

শিবরাণীর মুক্তির পর কয়েকদিন অতিশয় অস্বস্তিতে কাটিয়াছিল। কিন্তু চলিত অবস্থার সহিত নিজেকে মানাইয়া লইবার শক্তি মেয়েদের নাকি অপরিসীম, সেই জন্য মনের বিরহ মনেই চাপিয়া সকলের সহিত মিলিয়া গেলাম। মেয়েরা নূতন শ্বশুরবাড়ী গিয়া কি করে? অপরিচিতের ভিড়ের ভিতর ঢুকিয়া তাহাকে এক একটা করিয়া সম্পর্ক পাতাইতে হয়! যে স্ত্রীলোককে কখনও দেখি নাই, নিকট ও দূর কোনরূপ আত্মীয়তার সম্বন্ধ নাই তাহাকে শাশুড়ী বলিয়া পায়ের ধূলা লইতে হইবে, ছোকরার দলকে ঠাকুরপো বলিয়া ডাকিয়া তামাসা করিতে হইবে, ভাসুর নামক একটি জীবকে দেখিয়া আড়াই হাত ঘোমটা টানিয়া খাতির করিতে হইবে, কলহ-প্রিয়া বিধবা পিসি ও গোয়েন্দা ননদকে তুষ্ট না করিয়া উপায় নাই, এবং পরিশেষে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সহিত একই শয্যায় রাত্রিবাস করিতে হইবে, সমাজ ও শাস্ত্রের ইহাই নির্দেশ। লোকটার কোন পরিচয় পাইব না, কিছুমাত্র বিচার করিবার সুযোগ মিলিবে না।

শিবরাণী থাকিতে যে সকল মেয়েদের অসহ্য বোধ হইত তাহারা ধীরে ধীরে সহনীয় হইয়া আসিল। দিনের বেলায় ইহারা একরূপ করিয়া কাটায়, কিন্তু রাত্রে ইহাদের অপরূপ চেহারা। সেই চেহারার বর্ণনা আমি করিব না, আমিও ইহাদের স্বজাতি, কেবল

এই কথা বলিব, স্বামী-সন্তান লইয়া ঘরকন্না করিলেই বাঙালী মেয়েরা তুষ্ট থাকে, রাজনীতি চর্চা তাহাদের পক্ষে বেমানান, কারণ তাহার জন্য মেরুদণ্ডের আবশ্যক। নিতান্ত প্রৌঢ়া হইলে যদি বা তাহাদের দ্বারা কিছু কাজ হয়! বেচারীদের দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখবোধ করি। ইতিমধ্যে কয়েকটি হিষ্টিরিয়া রোগীও দেখিয়াছি। সামান্য কারণে মণিমালা এমনই হাসিতে থাকে যে, তাহার বুঝি বা দম বন্ধ হইয়া আসে। একজনকে দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া প্রায়ই কাঁদিতে দেখা যায়, কেহ অকারণে কলহ বাধাইয়া তুলে, কেহ সারাদিন ধরিয়া মাঝে মাঝে আয়না ধরিয়া নিজের চেহারাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, কেহ অতর্কিতে অন্যের শরীরের যেখানে সেখানে চিম্‌টি কাটিয়া পলায়, কেহবা নোংরা গল্প বলিয়া অনেককে মাতাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। কাহারও ফিট্ হয়—দুই চারি ঘণ্টা দাঁতি লাগিয়া হাতের মুঠা বন্ধ করিয়া গোঁ গোঁ করে, কাহারও ভীষণ মাথা ধরে, কাহারও নিদ্রাহীনতা। কোথায় যেন কোন্ এক দেশনেতা বলিয়াছিলেন, কারাগার আমাদের তীর্থ! খুব সম্ভব তিনি সদ্য কারাগার মুক্ত সত্যবাদিনী দেশ-সেবিকার মুখের স্বীকারোক্তি শুনিলে তাঁহার এই ধারণার কিছু পরিবর্তন করিতেন।

দেখিলাম কারাগারের শাস্তি মেয়েদের উপরেই সফল হয়। সহজ লীলা না পাইলে ইহাদের স্বভাবের বিকৃতি ঘটে দেখিলাম। একটা ছোট ঘটনার কথা বলিব। সেদিন এক ভদ্রমহিলা তাঁহার

শিশুপুত্রটি সঙ্গে লইয়া তাঁহার তরুণী কন্যাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দেখা সাক্ষাৎ হইবার পর জন দুই মেয়ে গেটের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ভদ্রমহিলার কোল হইতে শিশুটিকে লইয়া ভিতরে ঢুকিল। আমি অদূরে দাঁড়াইয়াছিলাম। দেখিলাম সেই শিশুকে ছিনাইয়া লইবার জন্য অন্ততঃ এক শত ক্ষুধার্ত বাহু সংগ্রাম করিতেছে। ছেলেটা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন করিয়া তাহারা তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল যে, মনে হইল, খণ্ড খণ্ড করিয়া উহার মাংস ছিঁড়িয়া লইলে উহাদের ক্ষুধা মিটে। ইহারই নাম আদর ও স্নেহ! অবশেষে ডেপুটি জেলর সকলকে ধমক দিয়া যখন ক্রন্দনরত শিশুকে আনিয়া তাহার জননীর কোলে প্রত্যার্পণ করিলেন, দেখা গেল, শিশুর শরীরে অসংখ্য দাঁতের দাগ, নখের আঁচড়, এবং তাহার সর্বাঙ্গ লালাসিক্ত, কচি ঠোঁটে রক্তবিন্দু ফুটিয়াছে! রাক্ষসীরা তখনও চারিদিক হইতে বাহু বাড়াইয়া খল খল অট্টহাসি হাসিতেছিল। আমার চোখে অশ্রু আসিল।

ইহাদের পাশে শিবরাণীর মুখখানি কল্পনা করিলাম। যাইবার দিন আমি তাহার মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিয়াছিলাম, কপালে তেল-সিঁদুরের টিপ পরাইয়াছিলাম। প্রসন্ন, সংযত দেবীর মূর্তি, মানসিক অসংযম অথবা আত্মনিগ্রহের চিহ্ন তাঁহার মুখে কোথাও নাই। সত্যস্নাত মুখে অপরূপ হাসি, সে-হাসি যেন অসীম ক্ষমায় রাজশক্তির দেওয়া সমস্ত অন্যায় লাঞ্ছনাকে করুণা করিতেছে;

নিমীলিত চক্ষে স্নেহার্দ্র দৃষ্টি সকলের স্খলন-পতন-দোষ-ত্রুটি সমস্ত মানিয়া লইয়াও যেন সকলের কল্যাণ-কামনা করিতেছিল। বহু জন্মের তপস্যা না থাকিলে এই দেবীমূর্তির মহিমান্বিত প্রেমের আস্বাদ কে পাইবে? নবেন্দু যে কত বড় দুর্ভাগা সেই কথা আর একবার স্মরণ করিয়া শিবরাণীর পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখিয়া সহাস্য অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, ওকি পাগলামি করিস, যমুনা?

পূজারিণীর ন্যায় তাঁহার পদতলে বসিলাম। আবেগে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম, মাধুর্যের ধারা রোধ করিতে পারিলাম না। তাঁহার দুইটি জানু আলিঙ্গন করিয়া প্রণয়রসের বন্যায় ভাসিয়া বলিলাম, 'জনম জনম হাম ও-রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।'

এমনি করিয়া শিবরাণীকে বিদায় দিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে অনেক মেয়েই মুক্তি পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। দেশের হাওয়া কিছু ফিরিয়াছে, গ্রেপ্তারের হিড়িক কমিয়াছে। সভা, শোভাযাত্রা, আইন অমান্য, সন্ত্রাসবাদ সমস্তই ফিকা হইয়া আসিল। নূতন মেয়ে আর বড় একটা ভিতরে আসিতেছে না। আমাদের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতে লাগিল। বাহির হইতে সংবাদ পাইলাম, আন্দোলনের শেষ চিতাগ্নিতে মহাত্মা গান্ধী জল ছিটাইয়া দিতেছেন। এমন একদিন গোপনে শিবরাণীর নিকট হইতে ছোট্ট একটি চিঠি আসিল। নিভৃতে গিয়া আকুল আগ্রহে তাঁহার চিঠি

পড়িলাম। তিনি লিখিয়াছেন, 'কলকাতা থেকে চলে এসেছি, ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে। মামার ওখান থেকে খবর পাবো তুমি কোন্ তারিখে ছাড়া পাবে। কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হোয়ো না, তারিখটা জানতে পারলেই আমি সব ব্যবস্থা করবো। সন্তোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে প্রায়ই তোমার প্রসঙ্গে মেতে ওঠে।'

গান জানিতাম। দীর্ঘ দিনমান যখন আর কাটিতে চাহিত না, তখন গান ধরিয়া দিতাম। সে-গানের সুর বাদ্যযন্ত্রের সহিত না মিলিলেও আমার প্রাণের সহিত মিলিত। নিজের গান নিজেকেই শুনাইতাম। আগে কণ্ঠ ছিল কর্কশ, এখন গলায় কে যেন মধু ঢালিয়া দিয়াছে। অতিরঞ্জিত আত্মপ্রশংসা নহে, আমি গান গাহিতে থাকিলে ওদিকে মেয়েদের কলরব থামিয়া যাইত। একবার থামিলে দ্বিতীয়বার গাহিবার জন্য অনেকেই আসিয়া অনুরোধ জানাইত।

যতই মুক্তির দিন ঘনাইয়া আসিল ততই যেন অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলাম। দুরন্তপনা বাড়িয়া গেল। স্নানের ঘরে ঢুকিয়া চৌবাচ্ছায় ডুবিয়া থাকিতাম। কেহ দরজা ঠেলিলে বলিতাম, গলায় দড়ি দিয়েছি, মেট্রনকে খবর দাও। কখনো বা পুরুষ-ছেলের মতো কাছা-কোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কেহ কেহ শিহরিয়া আমার দিকে স্তব্ধ চক্ষে চাহিয়া থাকিত। আমার

স্বাস্থ্য ছিল কঠিন নিটোল। একদিন ভীষণ গোলমাল বাধিল। আমি প্রাচীর ডিঙাইয়া পলাইয়াছি মনে করিয়া মেট্রন চেঁচামেচি করিতে করিতে গিয়া আপিস ঘরে খবর দেয়। সকলে ছুটিয়া আসিয়া চারিদিক তোলপাড় করিয়া খুঁজিতে থাকে। তারপর এক সময় তাহারা উপর দিকে চাহিয়া দেখিল, আমি অশ্বত্থ গাছটায় চড়িয়া দুই ডালে দুইটা পা রাখিয়া হাসিতেছি। শাস্তি স্বরূপ আমি একটা দিনের 'রেমিশন' পাইলাম না।

দৌরাত্ম্য না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু একদা হঠাৎ শান্ত হইয়া গেলাম। কৃষ্ণাবেন নামক একটি গুজরাটি মহিলা ছিলেন। তিনি একদিন আড়ালে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, আর কিছু ক'রো না যেন, ধ'রে নিয়ে গিয়ে লঙ্কাবাটা লেপে দেবে এরা, সাবধান!

লঙ্কাবাটা!

কথাটায় যাদু ছিল, আর কোনোদিন অশান্ত হই নাই।

অবশেষে একদিন আমারও শৃঙ্খল খুলিল। জেল প্রায় খালি হইয়াছিল, জন চারেক মেয়ে-ডেটিনু ছাড়া বাকি কয়েকজনের মেয়াদও ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহারা শীঘ্রই বাহির হইবে।

প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিলাম। মেয়েরা আমাকে কাপড় পরাইল, চুল বাঁধিয়া দিল। জলযোগের আয়োজনে জেল কর্তৃপক্ষ কৃপণতা করে নাই। সকালবেলা নূতন ধোপদস্ত শাড়ী তাহারাই পাঠাইয়াছে, নূতন স্যাণ্ডালও দিয়াছে। মেয়েরা গেট পর্যন্ত

আসিয়া বিদায় দিল। আমি আপিস ঘরে আসিলাম। অফিসারের কাছে শিবরাণীর দেওয়া দুইগাছা সোনার চুড়ি ছিল, তাহা ফিরিয়া পাইলাম। গাড়ী ভাড়া বাবদ দুইটা টাকা দিল। ছাড়া পাইলাম বটে কিন্তু তখন কে জানিত আমার মেয়াদ তখনও অনেক বাকি।

অফিসার বাহির পর্যন্ত আসিয়া হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, তোমার লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দোহাই মা, তুমি আর এসো না। তুমি আবার এলে আমরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালাবো। বিয়ে ক'রে সংসারী হও এই প্রার্থনা করি।

হাসিয়া বলিলাম, বিয়ে করব কিনা জানি নে, তবে আপনাকে ভুলবো না। স্বরাজ পাওয়া গেলে আমি আপনার ভালো চাকরি জুটিয়ে দেবো। আচ্ছা, নমস্কার।

লোকটা আমার দম্ভ দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া দেখি শিবরাণীর মামীমা এবং সন্তোষ আমার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। তিনজনেরই মুখে এক গাল করিয়া হাসি ফুটিয়া উঠিল। আমি গিয়া মামীমার পায়ের ধূলা লইলাম, কিন্তু কটাক্ষে দেখিলাম সন্তোষের স্বাস্থ্যের খুব উন্নতি হইয়াছে।

মামীমা আমাকে আদর করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, ধন্যি মেয়ে তোরা, জেলখানাকে জলখাবার ক'রে তুললি। এবার দড়ি দিয়ে বাঁধবো তোদের চল্।

রাণীদির খবর কি মামীমা?

জানিনে ক' বাছা, চাকরি বাকরি ঘুচিয়ে এবার পল্লীসংস্কারে মন দিয়েছেন। পোড়া কপাল!

মামীমা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আড়ালে পাইয়া সন্তোষ বলিল, কপাল মন্দ, বয়সে বড় হয়েও কারো প্রণাম পেলুম না।

তাহার দুষ্ট বুদ্ধিটা তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিলাম। হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইলাম, এবং সেই ধূলাই তাহার মাথার চুলে মাখাইয়া দিলাম।

শোধ নেবো আমি, ব'লে রাখলুম। এই বলিয়া সন্তোষ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, আমি মামীমার পাশে গিয়া বসিলাম। ভাড়াটে ফীটন্ ছুটিয়া চলিল।

মামীমা প্রশ্ন করিলেন, হাতে দাগ কিসের রে?

তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া সন্তোষ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিল। কৌতুক ও কুটীলতায় ভরা তাহার সেই হাসি যেন আমার গায়ে লঙ্কাবাটা লেপিয়া দিল। মামীমার সম্মুখে অতি কষ্টে চুপ করিয়া রহিলাম কিন্তু তাঁহার অলক্ষ্যে আমার পায়ের স্যাণ্ডালের অগ্রভাগ দিয়া সন্তোষের পায়ের আঙুল প্রাণপণে টিপিয়া ধরিলাম। আড়ালে পাইলে একবার তাহাকে দেখিয়া লইব। দেখিতেছি, সন্তোষ একটুও বদলায় নাই।

মুখে বলিলাম, মেট্রন আমাদের সকলকে ভারি জ্বালাতন করতো, একদিন তার সঙ্গে মারামারি করেছি।

সন্তোষ বলিল, মেট্রন মেয়ে না পুরুষ?

## ঘুমভাঙার রাত

রাগিয়া বলিলাম, অভিধান খুলে দেখে নিয়ো, মেট্রন পুরুষ হয় না।—এই বলিয়া পুনরায় তাহার পায়ের আঙুল জুতা দিয়া টিপিয়া ধরিলাম।

সে গ্রাহ্য করিল না, স্থির হইয়া রহিল, তাহার অসামান্য সহ্যশক্তি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। এক সময় মামীমাকে লুকাইয়া তাহার মুঠার মধ্যে জেলর সাহেবের দেওয়া দুইটা টাকা গুঁজিয়া দিলাম। সন্তোষ একটু হাসিল মাত্র।

অনেকদিন পরে পথ-ঘাটের অবারিত মুক্তির ভিতরে আসিয়া হাঁপ ফেলিলাম। পথ হইতে পথ, কত জনপদ, কোথাও দেওয়াল নাই, কোথাও নাই শাসনের সতর্ক চক্ষু। বিচ্ছিন্ন নির্বাসন আর নাই, সবাই যেন আপন হইয়া বুকের কাছে আসিয়াছে। জানি না এই মুক্তির স্থায়ীত্ব কতটুকু।

সকালের আলোটুকু অতি কোমল। পথের বাঁকে বহুদূর পর্যন্ত নজরে পড়িতেছে। দক্ষিণ বাতাসের ঝলক মধুর লাগিতেছিল। মনে হইল আবার এক নূতন জীবনে উত্তীর্ণ হইলাম। কিন্তু এই জীবনের ভালো-মন্দ, দুঃখ-বেদনার সহিত আমাদের পরিচয় নাই। নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবন, সুখের সংসার, আত্মীয় স্বজনপরিবৃত গৃহস্থালী ইহাদের কথা কল্পনাও করিতে পারিনা। আমরা যেন সৈনিকের জীবন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কাজের জীবন হইতে যেন আজ অল্প সময়ের জন্য ছুটি মিলিল, ছুটি ফুরাইলে আবার যেন চলিয়া যাইতে হইবে। এই যে পথের দুইধারে লোকযাত্রা

চলিয়াছে, খণ্ড খণ্ড গৃহস্থের দল তাহাদের প্রাত্যহিক প্রাণধারণের আয়োজনে নানাদিকে ছুটিতেছে,উহাদের সহিত আমাদের অন্তরের যোগ নাই। আমাদের জীবনে ভিত্তিও নাই, শিকড়ও নাই, ক্ষণিকের স্বাচ্ছন্দ্যসুখ, মুহূর্তের আনন্দ, সামান্য স্নেহের স্পর্শ, দুর্যোগের রাত্রে একটু নিরাপদ আশ্রয়—ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সম্মুখে যে যুবকটি বসিয়া আছে ইহাকেও এমনি জীবন যাপন করিতে হয়। আজ দুইজনে একত্র চলিতেছি আগামী কাল হয় ত কে কোথায় ভাসিয়া যাইব তাহা কে বলিতে পারে! অথচ ইহার মুখে দুশ্চিন্তার কোনো ছায়া নাই। এক বৎসর পূর্বকার সেই হাসিমুখ আজিও অম্লান আছে! অথচ ধনীর পুত্র, পিতার একটিমাত্র সন্তান, ইচ্ছা করিলে জীবনের কোনো বাসনাই সে অপূর্ণ রাখিত না—কিন্তু তবু ত তরঙ্গে তরঙ্গে ইহার প্রাণ টলমল করিয়া উঠিয়াছে। নিদারুণ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের মধ্যে এই যুবকের কী অপরিসীম আনন্দ। পরাধীন দেশের সেবার বিড়ম্বনা হাসিমুখে সহ্য করিয়া চলিয়াছে, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে এতটুকু কার্পণ্য করে নাই। জানে ইতিহাসে অমর হইবে না, সংবাদপত্র সুলভ প্রশস্তি গাহিবে না, স্বরাজ পাইলে কোনো উচ্চাসনে সে প্রতিষ্ঠা পাইবে না —তবু নিঃশব্দে প্রাণের শিখাটি জ্বালাইয়া সে চলিয়াছে। নিদারুণ দুঃখের রাতে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত অম্লানবদনে সহিয়াছে, কিন্তু আপন আদর্শ তাহার কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

কখন্ চোখে অশ্রু ভরিয়াছে জানি না, সহসা গাড়ী থামিতেই

চমক ভাঙিল। আমিই আগে গাড়ী হইতে নামিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিলাম।

সকলে উপরে উঠিয়া আসিলাম। মনে হইল বাড়ীর ভিতরটা যেন সংকীর্ণ হইয়া গেছে, ঘরগুলা যেন ছোট ছোট—সেই বারান্দা, সেই দালান, সেই উঠান, পা বাড়াইলেই যেন সব ফুরাইয়া যায়। পথের বাহিরটাই যেন থাকিবার জায়গা, কয়েদখানাটাই যেন আপন—আবার সেইখানে ফিরিয়া যাইতে না পারিলে যেন স্বস্তি পাইব না। রাণীদির ঘরে ঢুকিয়া ক্লান্ত হইয়া একখানা চৌকীতে বসিলাম।

মামীমা অন্দর মহলে গেলেন। মামা আপিসে গিয়াছেন। ছেলেপিলেরা আসিয়া একবার আমাকে দেখিয়া চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে সন্তোষ আসিল।

চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া আমি হাসিলাম, এবং লজ্জাসঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইলাম। বলিলাম, মামীমার সাম্‌নে দুষ্টুমি করছিলে কেন, তাই ত পা মাড়িয়ে দিয়েছি। লেগেছে খুব, কই দেখি ?

সন্তোষ আমাকে বাধা দিল। বলিল, নতুন দেখছি তোমাকে, কথায় কথায় পায়ে হাত কেন ?—বাঃ যাই বলো, চেহারাটা বেশ মানানসই ক'রে এনেছ ত ? যাকে বলে, মরা নদীতে জোয়ার ! কূল ছাপিয়ে উঠেছে।

আমি হাসিমুখে বলিলাম, আমরা দেশসেবিকা, পরিহাসবোধ

আমাদের না থাকাই ভালো। থাকলে বলতুম, কমল-কলি ফুটেছে!

আমার মুখে এই উক্তি সন্তোষ আশা করে নাই, সে যেন একটু চকিত হইল। বলিল, জানো এসব কথা আমি আজকাল বুঝতে পারি? কমল কলি-টলি বুঝি নে, দেখছি এক বছর আগেকার মানুষ আর তুমি নেই।

বলিলাম, আজ প্রথম দেখা, আজই ঝগড়া আরম্ভ করবে? কী দেখে বুঝলে যে, আমি সে-মানুষ আর নেই?

সন্তোষ মেঝের উপর বসিল, আমি দক্ষিণের জানালার থামালের উপর গিয়া বসিলাম। সন্তোষ কেবলই যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এক সময় বলিল, আমার চিঠির উত্তর দাও নি সে কথা আমি ভুলব না। আমি কোথায় ছিলুম, কেমন ছিলুম, কি ক'রে আমার চল্‌ত কিছুই তুমি জানতে চাওনি। মেয়েরা এমনি অভদ্র, এমনি তারা হৃদয়হীন। এবার আমি চিনেছি, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। আমি আর কাজকর্ম কিছু করতে পারব না।

আমি বাহিরের দিকে মুখ করিয়া হাসিতেছিলাম। প্রথম দেখা হইলে চিরকালই সন্তোষ এমনি করিয়া নিজের বিক্ষোভ-দাহন প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি জানি ইহা তাহার ভিতরকার উল্লাসের অভিব্যক্তি।

সে বলিতে লাগিল, গ্রামে অন্তরীণ ছিলুম, কুঁড়ে একটা ঘর,

সাপের বাসা, পোকামাকড়ের উৎপাত। একটা সুবিধে ছিল এই যে, মশার কামড়ে পাগল হলেও ম্যালেরিয়া হয়নি। খেতুম পোড়া ভাত, জঙ্গল চচ্চড়ি, রাত্রে ভুসির রুটি, রুক্ষু ডাল,···আরে, কই শুনছ না তুমি আমার কথা? তা কেন শুন্‌বে—তুমি কি আর সে-মানুষ আছো?

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনিয়া মুখ ফিরাইলাম। বলিলাম, সে-মানুষ নেই তবে কা'র সঙ্গে কথা বল্‌ছ?

না, সে-মানুষ তুমি নেই। এখন তুমি গুছিয়ে কথা বল্‌তে শিখেছ, চোখের মধ্যে তোমার নানান কথা, হাঁটুনিটা হয়েছে ঢলঢলে, শরীরের ভারে তোমার চালচলন গেছে বদলে।

এতে তোমার দুঃখের কারণ কি?

না, না, আমি এসব ভালোবাসি নে, এসব না হওয়াই ভালো। কত অসুবিধে জানো—কোথাও যাওয়া যায় না, একসঙ্গে কাজ করা চলে না। এই ধরো না, লোকে কি বল্‌বে—মানে কলঙ্ক রটাবার লোকের ত অভাব নেই!

চুপ—মামীমা!

মামীমা ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, রান্না চড়ালুম। দুপুরবেলা কোথাও বেরুনো হবে না বাছা, বাড়ীতে থাকবে।

বলিলাম, কাজ আছে যে মামীমা। দেখাশোনা করা, কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা—

সন্তোষ বলিল, আমাকে যে আজকেই চ'লে যেতে হবে। শিবরাণী সেখানে একলা আছেন, নতুন জায়গা—

মামীমা বলিলেন, তবে কি যমুনাকেও আজই নিয়ে যাবে ?

সে ত আমার হাত নয়, ওঁর ইচ্ছে। আমি বলি, মামীমার এখানে কিছুদিন থাকো, এঁরা ত কোনোদিনই তোমাদের সেবা পেলেন না !

পোড়াকপাল !—মামীমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, সেবা ! মাথা ঠাণ্ডা ক'রে নিজেরাই শান্ত হয়ে থাকুক তা হ'লেই আমাদের খুব বাবা ! রাজারাজড়ার ঘর থেকে এই দুই মেয়ের জন্যে সব পাত্র এসে ফিরে গেছে, তাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। ভালো ঘর, ভালো বর হ'লে, দশজনকে প্রতিপালন করলে সেই ত দেশের কাজ বাবা।

সন্তোষ বলিল, বটেই ত। তবে কি জানেন মামীমা, এবার দেখে মনে হয় চোখ খুলেছে, আপনার প্রস্তাবে আর অমত নেই।

মামীমা বলিলেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, আমি কালী-ঘাটে পূজো দেবো।—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলিলাম, মামীমার সামনে বুঝি ওই সব কথা বলে ?

সন্তোষ বলিল, এ ত তোমারই কথা। তুমিই ত বললে, কমল-কলি ফুটেছে. মানে—তোমার জ্ঞান হয়েছে !

তোমার মুণ্ডু !—বলিয়া তাহার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়া আমি ঘরের বাহির হইয়া গেলাম।

# দশ

মামীমা আমার কেহ নহেন। শিবরাণীর সহিত রাজনীতির ভিড়ে মিশিয়া এমনি নানাবিধ আত্মীয় পথ হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছি। তবে দিদি, দাদা, ভাই—এইগুলাই বেশি। ভাই-বোন সম্পর্কের অনেক বিকৃতি দেখিয়াছি, সেই সকল আকর্ষণ-বিকর্ষণের চেহারা প্রকাশ না করাই ভালো। যাহা হউক, মামীমাকে তুষ্ট করিবার জন্য একটা দিন থাকিতে হইল।

কিন্তু রাণীদি ছাড়া এ বাড়ীটা আমার নিকট নিতান্তই অর্থহীন তাঁহার অভাবে চারিদিকে যেন রিক্ত। মামীমার কথাবার্তা শুনিয়া যেন মনে হইল, রাণীদির সহিত আর তাঁহার বনিবনা হইবে না। গৃহস্থদের সহিত রাজনীতিক জটলাটা খাপ খাওয়ানো কঠিন। মাতুল মহাশয়ও যেন আর আমাদের ভালো চক্ষে দেখিতেছেন না। ছেলেমেয়েরা পাছে আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় এই আশঙ্কায় তাহাদের দূরে দূরে রাখা হইয়া থাকে। অবশ্য তাহাতে আমরা আহত হই না, কারণ, এই সব আমাদের সহ্য হইয়া গেছে। দেশের কাজে স্বদেশবাসীর বাধা ও আপত্তি যে কতখানি তাহা এই চির-পদদলিত দেবভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিলে বুঝা যায় না। যাক্ সে কথা।

শিবরাণীর দল ইতিমধ্যে ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছে। আমাদের যে 'মহিলা-সভা' ছিল তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইবার পর তালা বন্ধ আছে। মেয়েদের সংবাদ অল্পস্বল্প যাহা পাইলাম তাহা উৎসাহজনক নয়। কেহ বিবাহ করিয়া ঘরে উঠিয়াছে, কেহ সংসারে ছেলেপুলে লইয়া ব্যস্ত আছে, কেহ বিদেশে গিয়াছে, কেহ পুনরায় কলেজে য়্যাডমিশন্ লইয়াছে, কেহবা দুর্নীতিতে ভাসিয়াছে। যে-দুই একজন আজিও শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের কেহ গ্রাহ্য করে না, কেবল সভা-সমিতির হুজুগ কোথাও পাইলে তাঁহারা যথাসময়ে গিয়া সভাপতির স্নেহচ্ছায়ায় বসেন, নিজেদের প্রাধান্য প্রকট করেন, নেত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। হিরণ্ময়ী মাসিমার খবর পাইলাম, শুনিলাম তাঁহার চোখে সোনার চশমা ও পায়ে স্যাণ্ডাল্ উঠিয়াছে। জেলে থাকাকালীন তাঁহাকে কোনো মেয়ে নেত্রী বলিয়া মানিত না, এই আক্রোশে তিনি জেলের ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদের নিকট মেয়েদের নামে কুৎসা করিয়া আসিতেন, তাঁহার এই গোপন দুষ্প্রবৃত্তি একদিন ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত হিরণ্ময়ী মাসিমার সদ্ভাব ছিল। তাহার কারণ তিনি যে ইংরাজী জানিতেন না, কয়েকটা শব্দমাত্র মুখস্ত রাখিয়া কাজ চালাইতেন একথা কেবল আমিই জানিতাম। একবার চব্বিশ পরগণার কোন্ এক গ্রামের দুই একজন কর্মীকে ধরিয়া পড়িয়া তিনি এক সভায় সভানেত্রী হন্, কিন্তু মুখে মুখে অভিভাষণ দিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। আমাকে ডাকিয়া

পাঠাইলেন। গেলাম। আশ্চর্য, সেদিন পর্যন্ত জানিতাম না যে এই তথাকথিত নেত্রীটির বাহ্যিক চাকচিক্যের অন্তরালে রাজনীতিক শিক্ষার কী শোচনীয় অভাব। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কয়েক ছত্র অসংখ্য বানান-ভুল করা বাংলা ভাষা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেইবার এবং তাহার পরে বার কয়েক আমি যে তাঁহার অভিভাষণ লিখিয়া দিয়াছিলাম, ইহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানে না। সংবাদপত্রে হিরণ্ময়ী মাসিমার কয়েকটা বক্তৃতা পড়িয়া নব্য রাজনীতিক মহলে সাড়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বস্তু না থাকিলে সমাদর দীর্ঘস্থায়ী হয় না—একদা তিনি ধরা পড়িলেন। অধুনা জনসভার শোভাবর্ধন করা ছাড়া আর তাঁহার কোনো মূল্য নাই। এখন কেবল প্রত্যহ প্রাতে [illegible] খানপাঁচেক দৈনিকপত্র কিনিয়া তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজেন, ছাপার অক্ষরে কোথাও তাঁহার নাম বাহির হইয়াছে কিনা।

আমাদের স্বনামধন্য বীণাদিদি রটনা করিয়াছে যে, তাঁহার ব্লাড-প্রেসারের অসুখ। চিকিৎসকের নিষেধ, [illegible] উত্তেজনা মূলক সংবাদ তাঁহার কানে না পৌঁছে। [illegible] ছাত্রীসঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট ছিলেন; কিন্তু গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তাঁহার ব্লাডের প্রেসার বাড়ে। তিনি একবার [illegible] গিয়া রটাইয়াছিলেন যে, পুলিশ তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়াছে, তাঁহার কাজ করিবার উপায় নাই। অর্থাৎ এই কথাটি জানিয়াছি, তাঁহার দেশসেবার নেশা কাটিয়া গেছে।

## ঘুমভাঙার রাত

সকলকে হার মানাইয়াছেন মল্লিকা মুখার্জী। তিনি বার-দুই পতি-পরিবর্তন করিয়া রাজনীতিতে নামিয়াছিলেন। আমরা খুব আশান্বিত হইয়াছিলাম। যাঁহারা সমাজ-নীতির দ্বারা উৎপীড়িত, কোথাও কোনো অনাচারকে যাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন নাই, জীবনে ক্ষয়-ক্ষতি যাঁহারা সহ্য করিয়াছেন—দেখা গিয়াছে অনেক সময়ে নিঃস্বার্থ দেশের কাজে তাঁহারা আত্মপ্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এইবার আসিয়া শুনিলাম, তিনি কিছুকাল পূর্বে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় এই সেদিন হিন্দু মিশনের সাহায্যে হিন্দু-ধর্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কারণটাও শুনিলাম। একজন এটর্ণীকে তিনি তিন-আইনে বিবাহ করিয়াছেন। ভদ্রলোক নাকি তাঁহাকে বালিগঞ্জে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিতেছেন। এখন নাম হইয়াছে, মিসেস নবনীতা মহাজন। আজকাল প্রায়ই তাঁহাকে সিনেমার দরজায় টিকিট কিনিতে দেখা যায়। তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিয়া হাসিমুখে মনে মনে আবৃত্তি করিলাম, "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে অনন্তযৌবনা উর্বশী।"

বিকাল বেলা বাহির হইলাম। মনে করিয়াছিলাম একবার 'আশ্রমে' যাইব কিন্তু উৎসাহ হইল না। পথে নামিয়া বাঁচিলাম কিন্তু পথে যে অবারিত মরুভূমি। ছয়মাসে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আগে পথে পা বাড়াইলেই স্তাবকের দল পাইতাম, আজ কোনো চেনা মুখই চোখে পড়িতেছে না। বাতাসটা যেন উত্তরের।

আবাহন অভ্যর্থনাও নাই, বিদ্রূপ কটাক্ষও কেহ করে না। যাহাদের জন্য জেল্ খাটিলাম তাহারা কোথায়? কে তাহারা? কোন্ দেশে তাহারা বাস করে? আজ মনে হইতেছে বার বার কারাগারে যাইতেছি কাহাদের জন্য? ত্যাগের মূল্য পাই নাই, তাহার আশাও করি নাই, কিন্তু যাহাদের জন্য এই ত্যাগ তাহারা পরম নিশ্চিন্তে জীবন নির্বাহ করিতেছে, কেহ ভ্রূক্ষেপও করে না। বড় বড় কথা বলিয়াছি—ধনিকের শোষণ, দরিদ্রের ডাল-ভাত, সাম্রাজ্যবাদীর লুণ্ঠনকৌশল, আম্‌লা-তন্ত্রের ধ্বংস, সাম্যবাদ, কিষাণ ও শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার, কিন্তু মনে হইতেছে নিজেদের কথা নিজেরাই শুনিয়াছি, উহাদের শুনাইতে পারি নাই। নিজেদের ব্যথা বাজিয়াছে, উহাদের অন্তরে কোনো বেদনা-বোধ জাগাইতে পারি নাই। আজ মনে হইতে লাগিল, শহরে সভাসমিতি করিয়া নানারূপে হাঙ্গামা বাধাইয়াছি সত্য, কিন্তু দেশের দুর্গম অন্ধকারে আলো জ্বালাইতে পারি নাই, জাতির মর্মস্থলে আমাদের আবেদন পৌঁছায় নাই। আজ বুঝিলাম, শিবরাণী সমস্ত ফেলিয়া কেন সেই দূর গণ্ডগ্রামে গিয়া কর্মকেন্দ্র খুলিয়াছেন। পথে চলিতে চলিতে রাণীদির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিলাম।

কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা হইল না। সমস্ত চিন্তার ভিতর দিয়া একটা কথা কেবল নিজের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে, আমার ভিতরে এই অহেতুক ক্লান্তি কেন? কেন মনে হইতেছে আমি আজ অদ্ভুত

একাকী ? বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে সকল মেয়েদের লইয়া মনে মনে পরিহাস করিতেছিলাম, তাহাদের জন্য যেন ঈর্ষা হইতে লাগিল। তাহারা যেন স্বাচ্ছন্দ্যের পথ বাছিয়া লইয়াছে, আমিই যেন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া চলিতেছি, আমার সঠিক পরিচয়টা যেন পদে পদে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। এবারে জেল্ হইতে বাহির হইয়া আমি নিজেকে চিনিতে পারিতেছি না, আমার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, চালচলন বদলাইয়াছে—সন্তোষের এই সকল অভিযোগের কারণগুলাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া যেন উড়াইতে পারিতেছি না।

স্নেহবুভুক্ষু মন অধীর যন্ত্রণায় রি রি করিতেছে; খানিকটা কাঁদিয়া, খানিকটা নিজেকে নিপীড়ন করিয়া যেন কিছু শক্তিক্ষয় করিবার ইচ্ছা হইতেছে। বাসায় ফিরিলাম সন্ধ্যার অনেক পরে। মামা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, ছেলেমেয়েরা, মামীমা একটা ঘুমন্ত ছেলের পাশে শুইয়া পাখার বাতাস করিতেছেন। কেহ যে কথাবার্তা কহিলেন না ইহাতে আনন্দ বোধ করিলাম। নিজেকে লইয়া কাহারও কাছে গিয়া দাঁড়াইতেও আমার লজ্জা করিতেছিল। গোপনে গিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় আহার শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ীর বাহিবের দিকে তেতলায় উঠিবার সিঁড়ি, মাঝখানে একটা মাত্র দরজা—সেই দরজা বন্ধ করিয়া দিলে তেতলার সহিত দোতলার গৃহস্থের আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। আমি একাকী থাকিতে ভয়

পাই না, সুতরাং সোজা উপরে উঠিয়া আসিয়া রাণীদির ঘরে ঢুকিলাম।

সেই রাত্রিটা আমার জীবনে অদ্ভুত। ঘরে আলো জ্বালিতে গিয়া সহসা চোখে পড়িল, পূর্ব ও দক্ষিণের চারিটা জানালা দিয়া জ্যোৎস্না ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। সুইচটা টিপিতে গিয়া হাত সরাইয়া আনিলাম, আলো জ্বালিবার প্রয়োজন নাই! সমস্ত সন্ধ্যা আত্মগত চিন্তায় পথে পথে ঘুরিয়াছি, মুখ তুলিয়া একটিবারও দেখি নাই, আজ আকাশভরা চৈত্র পূর্ণিমা। বঞ্চনার কথা ভাবিয়াছি; ভাগ্যবিড়ম্বনার অগণ্য নগণ্য ঘটনার কথা মনে করিয়াছি; ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, রাজনীতির ঝড়-ঝাপটা—সবই একে একে ছায়াচিত্রের মতো সরিয়া গেছে, কিন্তু তখন আকাশে যে এমন সর্বপ্লাবিনী জ্যোৎস্না ছিল তাহা ভ্রূক্ষেপও করি নাই। অন্ধকারে বাতাসে কাগজপত্র সরসর করিতেছে, বিছানার চাদর জ্যোৎস্নায় ধবধব করিতেছে, ঘরময় ধূলা ও জঞ্জাল হাওয়ায় উড়িতেছে—আমি ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, চোখ বুজিয়া ও চোখ খুলিয়া দেখিলাম, প্লাবনটা কেবল বাহিরের প্রকৃতিতেই নয়, আকাশের মহাশূন্য সাগরেই নয়, প্লাবন প্রবেশ করিয়াছে এই ধূলি-জঞ্জাল আবর্জনাময় অনাদৃত ঘরখানার মধ্যে, তাহার ধারা নামিয়াছে আমার এই উদ্বেলিত দেহের সর্বাঙ্গে, আমার প্রাণের রেণুতে রেণুতে। আমি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

সেই রাত্রিটা অদ্ভুত। জ্যোৎস্না এমন করিয়া কোনোদিন চোখে

পড়ে নাই, এমন করিয়া আমার সমস্ত চৈতন্যটাকে কণ্টকিত করিয়া তুলে নাই। দিনের বেলা যাহা কিছু স্থূল দৃষ্টিতে জানা যায়, এই জ্যোৎস্নারাত্রে যেন তাহাদের উপরে একটা ইন্দ্রজাল নামিয়া আসিয়াছে। এই অস্পষ্টতা অতি বিস্ময়কর। আমি যেন অকস্মাৎ বদ্ধজীবনের একটা কালো গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আলোক প্লাবনের নিচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেবল আমার চেহারাই বদলাইল না, প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিল। আমার দেশসেবিকার নানা বাধ্য-বাধকতার পরিচয়টাকে ঘুচাইয়া আমার স্ত্রীলোকের পরিচয়টাকেই যেন উদ্‌ঘাটিত করিল। আজিকার এই চন্দ্ররজনী আমাকে প্রস্ফুটিত করিতেই যেন হাজির হইয়াছে। উপরের ওই জ্যোতিষ্কলোক, নীহারিকামণ্ডলী, অগণ্য তারকার দল, সমস্তই যেন আমার আত্মবিকাশের প্রতীক্ষায় আছে ; অনন্ত সৌরমণ্ডলের নিত্য-ঘূর্ণমান গ্রহনক্ষত্রের দল যেন বিধিনিয়ম ভঙ্গ করিয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া আমার দিকে চাহিল। আমি বিলোল-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিলাম, যেন তাহাদের সকলের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। একটা বিচিত্র ও অনাস্বাদিত অনুভূতি আমার সর্ব-শরীরে খেলা করিতে লাগিল। জ্যোৎস্নার গলিত রজতধারা যেন আমার রক্তে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়াছে, যেন একটা অতি তীব্র মাদকদ্রব্যের গুণে আমার সর্বশরীর অচেতন হইয়া আসিতে লাগিল। সরিয়া যাইব মনে করিলাম, কিন্তু নড়িতে পারিলাম না, কেবল অনুভব করিলাম দক্ষিণলোকের মধুর বাতাসে আমার গায়ের

আঁচল উড়িয়া গেল। বাধা দিতে গেলাম, হাত নাড়িতে পারিলাম না। উপর হইতে পূর্ণিমার চন্দ্র কেবল আমার তনুলতার দিকে চাহিয়া সকৌতুক হাসি হাসিতে লাগিল। এমন করিয়া জ্যোৎস্নার মুকুরে কে কবে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়াছে? অর্ধচেতন অবস্থায় দাঁড়াইয়া আপন প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির একটি আশ্চর্য রূপ দেখিলাম। আমি আকুল হইয়া কাঁদিলাম, কিছু পাই নাই বলিয়া কাঁদিলাম, তৃপ্তিহীন যৌবনের মদির নেশায় অর্থহীন কান্না কাঁদিলাম—আমার সেই অশ্রুধারা গলিত জ্যোৎস্নার ন্যায় কপাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রিটা আমার জীবনে অদ্ভুত। আমার অতি নিকটে যে সেই রাত্রির ঐশ্বর্য ও অভিশাপ একত্র জমা হইয়া আছে তাহা পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জানিতাম না। সেই রাত্রে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটিল বলিয়াই তাহার কথা চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখিব।

পৃথিবীতে সেদিন আমি ভিন্ন দ্বিতীয় মানুষ ছিল তাহা ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ পদশব্দ শুনিয়া আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম। পিছন ফিরিয়া মানুষের ছায়া দেখিলাম, এবং দেখিলাম, সে আমারই নিকট সরিয়া আসিতেছে। আমি সহসা সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচল তুলিয়া মুখ ঢাকিলাম।

নিকটে আসিয়া সে আমার মাথায় হাত রাখিল। চাপা গলায় বলিল, উঠে এসো।

আমি উঠিলাম না দেখিয়া সে পাশে বসিল। চাপাস্বরে আমিও রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম, কেন এলে তুমি ?

তোমাকে নিয়ে যাবো !

কোথায় ?

জানতে চেয়ো না, চলো আমার সঙ্গে।

ভুলিয়া গেলাম আমি কি করিতেছি। সাপ যেমন করিয়া পাকে পাকে জড়াইয়া ধরে তেমনি করিয়া সহসা আমি সন্তোষের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম, আমাকে বলো তুমি ! এমন কথা বলো যা শুনলে আমি শিউরে উঠি।

সে আমার হাত ধরিয়া ঘরে তুলিয়া আনিল। আলো জ্বালিল না। বিছানায় বসাইয়া বলিল, এতদিন বলো নি কেন ?

বলিলাম, তুমি ত জানতে চাও নি ?

কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, আমি এসেছি গোপনে। এখুনি তোমাকে নিয়ে চ'লে যাবো। প্রস্তুত হও।

এতদিন সন্তোষের নিকট কোনো স্বীকারোক্তি করি নাই, আজ হঠাৎ সমস্ত অবরুদ্ধ ভাষা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া যেন মধুর অবসাদে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া বলিলাম, না, না, আমি কোথাও যাবো না, কিচ্ছু পারব না। আমাকে তোমরা ছুটি দাও।

সে আমাকে সস্নেহে টানিয়া তুলিয়া লইল। আমি নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সামাজিক নীতিবোধ, অধিকারের

বৈধতা সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। এতকাল ধরিয়া যে সকল কারণে মেয়েদের কটূক্তি করিয়াছি সেই সকল কারণগুলি আমার ভিতরেও ঘটিতেছে দেখিয়া হাসি পাইল। কিন্তু আজ অনুভব করিলাম, পুরুষের দৃঢ় বাহুর আলিঙ্গন নারীর পক্ষে কত বড় সান্ত্বনার আশ্রয়, তাহাদের নিপীড়ন কতখানি মাধুর্যরসে বিহ্বল।

সন্তোষ বলিল, তুমি যে চেয়েছিল আমি জান্‌বো কেমন ক'রে?

বলিলাম, আমি যে চাইব তা জানতুম কোথায়?

হয়েছে? এইবার চলো।

না, হয় নি।

সন্তোষ আমার কানে কানে বলিল, রাত অচেতন, সবাই ঘুমিয়ে। যাবার সময় চুপি চুপি চ'লে যাবো, কেউ জানবে না। জোৎস্নায় যাবো পথ চিনে চিনে।

বলিলাম, তুমি চোরের মতন এলে কেন? আমি যে সারাদিন ছিলুম ব'সে তোমার জন্যে?

আমারই জন্যে?

তোমারই জন্যে। সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়েছিলুম—সত্যি, বিশ্বাস করো—তোমারই খোঁজে। কেন আসো নি, কেন—কেন—কেন নষ্ট করলে সম্পূর্ণ একটা দিন। বাঘিনীকে তুমি ভয় করো না?

আগল যখন ভাঙিল তখন পাগল হইতে আমার বিলম্ব হইল না, উৎপীড়ন করিয়া সন্তোষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিলাম। সে কিছু বলিল না, কেবল এক সময় আমার পাশে বসিল।

## ঘুমভাঙার রাত

বলিলাম, কী দেখছো?

দেখছি তোমাকে।

বিহ্বল মত্তকণ্ঠে বলিলাম, ছাখো, ছাখো, বাধা দেবো না। আজ আমার প্রাণের মধ্যে দিগন্তজোড়া উৎসব, তুমি তার হোতা। এই উৎসবের প্রাণমন্দিরে ব'সে তুমি সব জাগিয়ে তোলো, মাতিয়ে তোলো, সব ফুল ফুটিয়ে তোলো।

সন্তোষ বলিল, কিসের গন্ধ তোমার গায়ে? গোলাপের পাপ্ড়ি ঘষেছিলে?

বলিলাম, না, জ্যোৎস্নার দাগ লেগেছে।

সে আমার আঁচলে মুখ ঢাকিল। রুদ্ধজড়িত স্বরে বলিল, রক্তকমলের গন্ধ, মৃদু, করুণ। তোমার যে এত ঐশ্বর্য কে জান্ত যমুনা? কোথায় ছিল এই প্রাণের বন্যা?

আমি তাহার কানে কানে বলিলাম, তুষারের স্তূপে প্রাণ-সঞ্চার হোলো সূর্যের অনুগ্রহে। তোমারই উত্তাপে নেমে এলো চৈতন্যের ধারা।

সন্তোষ বলিল, কতদিন আগে থেকে তোমাকে দেখছি, কোনদিন কেউ তোমার কাছে প্রশ্রয় পায় নি। তোমার সেই আত্মবিস্মৃত অপূর্ব সরলতায় মনে মনে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করি নি। প্রত্যাশা তোমার কাছে কিছু ছিল না, তাই অত সহজে কথায়-কথায় তোমার সঙ্গে বিবাদ বাধাতুম।

বলিলাম, ভালোবাসো নি?—বলিয়া এমন করিয়া হাসিলাম,

যে-হাসি আবহমান কাল হইতে নারীর পদতলে পুরুষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে।

না, আদর করেছি অলস কল্পনায়, অন্তরীণ অবস্থার মধ্যে ব'সে তোমাকে নিত্য স্বপ্ন দেখেছি।—সন্তোষ বলিল, তোমার অসাধারণ কাঠিন্য আর বৈরাগ্য দেখে মনে করেছিলুম যৌবন-চেতনা তোমার কিছুই নেই—তোমার ভালোবাসা পাবে কোন্ সে ভাগ্যবান্?

বলিলাম, সন্তোষ, একে অন্যায় মনে করো না, এইটিই স্বাভাবিক। এরও দরকার আছে, এটাও সত্যি। যদি প্রকাশ না করি তবে সেই আত্মপ্রতারণা ছড়িয়ে যায় সকল স্থানে, এর ন্যায্য মূল্য না দিলে জীবনে পদে পদে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হ'তে থাকে। সেইটিই বড় দুর্দিন।

সন্তোষ বলিল, কিন্তু তুমি জানো এরই সর্বনাশা আগুনে পুড়ে অনেক দেশনেতা আর নেত্রী খাক হয়ে গেছে? তুমি জানো এর জন্যে কত মালিন্য, কত নোংরামি আর কত দুর্নাম?

বলিলাম, একে সহজে স্বীকার ক'রে নিলেই ত এর লজ্জা ধুয়ে যায়। শুধু এই প্রার্থনা করা যেতে পারে, এই নিয়ে যেন ওরা অন্ধ হয়ে না যায়। এইটি যেন হয় শক্তির উৎস, এই শক্তি যেন সব কাজের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে, বড় হ'তে শেখায়, ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। এ যেন পথ দেখায়, এ যেন না পথ ভোলায়।

সন্তোষ আমাকে আদর করিল, আমার দেহের তট যেন তরঙ্গে তরঙ্গে চুরমার হইতে লাগিল, যেন কুলনাশিনী পদ্মায় প্লাবনের ভাঙন

ধরিয়া গেছে। আমি নীরবে তাহার নিকট আত্মসমর্পন করিলাম। আমি জানি আজ যাহা পাইলাম, কাল তাহা পাইব না। ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কোন্ চড়ায় ঠেকিব তাহা জানি না। ভালোবাসা আমাদের জন্য নহে, সংসার করিবার অধিকার আমাদের নাই, যাহা পাইলাম তাহা চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার মতো স্থান আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আজ এই আনন্দের মাঝখানে যেন নিবিড় দুঃখ জন্মগ্রহণ করিল। যাহা কখনও পাই নাই তাহা না পাইলে বরং বৈরাগ্য ও বিষণ্নতায় একরূপ করিয়া চলিয়া যাইত কিন্তু আজ যে-তৃষ্ণার সূত্রপাত হইল, তাহারই অতৃপ্ত পিপাসা থাকিয়া-থাকিয়া যে-যন্ত্রণা আমাকে দিবে তাহার ভয়াবহ চেহারা ত কারাগারের ভিতরেই দেখিয়া আসিয়াছি।

সন্তোষ বলিল, এইবার চলো নৈলে তোমার বিপদ ঘট্‌বে, বুঝলে?

আমি তাহাকে উঠিতে দিলাম না।

সে বলিল, তবে সত্যি কথাই বলি যমুনা, তোমাকে কাল ভোরে গ্রেপ্তার করবে খবর পেয়ে এসেছি। আজ তোমাকে সরিয়ে না রেখে এলেই চলবে না।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। বলিলাম, তবে কি ওরা জানতে পেরেছে?

কানাই মিত্তির স্বীকারোক্তি করেছে। মেয়েদের মধ্যে কেবল তোমার নাম বলেছে। ওরা তোমাকে আর বাইরে রাখতে সাহস করছে না, অন্তরীণে পাঠাবে।

চার্জ কিছু আছে ?—প্রশ্ন করিলাম।

সন্তোষ বলিল, খুব সম্ভব না।

কিন্তু কোথায় পালাবো ?

নেপালে যাবে। মোকামায় তোমার জন্যে লোক থাকবে। উত্তর বিহারের ট্রেণ ধ'রে চ'লে যাবে। নেপালে আমার মাসীমা আছেন। মেসোমশাই মহারাজার খুব প্রিয়।

আমার বুকের রক্ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি শুইয়া পড়িলাম। বলিলাম, আমি পালাবো না।

কী বল্‌ছ তুমি ? পাগল !—বলিয়া সন্তোষ ঝুঁকিয়া পড়িল।

আমি তাহার গলা ধরিয়া বলিলাম, আমি ধরা দেবো।

সর্বনাশ ক'রো না। আমি শিবরাণীকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি ?

বলিলাম, আর একবার খবর পাঠিয়ো যে, এই বাংলার সোনার মাটি ছেড়ে সে যেতে রাজি হয় নি। পালিয়ে বেড়াবার অগৌরব সে নেয় নি, ধরা দিয়ে সে জয় করেছে।

সন্তোষ বলিল, কাঁদছো তুমি ?

বলিলাম, হ্যাঁ। ধরা পড়বো সেই আশঙ্কায় নয়, আজকের এই রাতটুকু যে কত ছোট তাই মনে ক'রে। এখনি তোমাকে যেতে দেবো না, আর একটু থাকো।

কঠিন করিয়া সন্তোষ আমাকে ধরিল। বলিল, কেন ধরা দেবে তুমি ? কবে ছাড়া পাবে তার ত কোনও নির্দেশ নেই। কেন যন্ত্রণা দেবে তুমি আমাকে ? কেন কাঁদবে আমাকে পথে পথে

ঘুরিয়ে?—অশ্রু গদগদ কণ্ঠে সে পুনরায় বলিল, যেতে দেবো না তোমাকে, আমি নিজে তোমাকে নিয়ে চ'লে যাবো দূর দেশে যেদিকে মন চায়, কোনোদিন ফিরব না। ছোট ঘরকন্না পাতবো নদীর ধারে, মল্লিকা-মালতীর বেড়ায় ঘেরা নিভৃত কবিকুঞ্জ—সেই হবে আমাদের ভালোবাসার তীর্থ-মন্দির। জান্‌লার ধারে এমনি ক'রে নামবে জ্যোৎস্নার ধারা, রজনীগন্ধার মুখচোরা গন্ধে—

তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলাম, রাণীদির কঠিন তপস্যাকে মনে করো, স্মরণ করো বন্দিনী জননীর উৎপীড়িত প্রাণ। সুখের লোভ কেন দেখাবে? কেন ঠেলে দেবে না ভয়ঙ্করের দিকে? ভালোবাসা কি কেবল সুখের পথ খুঁজে ফিরবে? দুর্গমের দিকে কি তার গতি নেই? ক্ষয়, ক্ষতি, ব্যর্থতার কথাটাই বড়, ভালোবাসার আর কি কোনো পরিচয় নেই?

সত্যি নয়, সত্যি নয়, মেয়েমানুষের মুখে ওকথা সত্যি নয়। যুগের হাওয়ায় ওই বীজ এসেছে মেয়ের মধ্যে, স্বভাবকে তোমরা নিপীড়ন করতে চাইছ।—সন্তোষ চেঁচাইয়া উঠিল, যেতে দেবো না তোমাকে, যখন পেয়েছি তখন নিঃশেষ ক'রে পেতে চাই। পেয়ে হারাবো কেন? কেন বুকের রক্ত চক্ষু দিয়ে ঝরাবে চিরদিন? যেতে তোমাকে দেবো না, বিয়ে করব তোমাকে, তুমি হবে আমার স্ত্রী।

আমি উঠিয়া সন্তোষকে প্রণাম করিলাম। বলিলাম, আমি

যেন তোমার যোগ্য হ'তে পারি। যেন নির্ভয় সাহসে তোমার পথে চলতে পারি। দাসী নয়, দেবী নয়, আমি তোমার সঙ্গিনী, সহধর্মিণী। আশীর্বাদ করো যেন মহৎকাজে, বিপুল সেবায় সর্বজনের মঙ্গলে, দেশের বন্ধন-মোচনে আমি তোমার যোগ্য সহধর্মিণী স্ত্রী হই।

সন্তোষ বলিল, তবু তুমি ধরা দেবে যমুনা?

হ্যাঁ, ধরা দেবো। তার কারণ তোমাকে কঠিন ক'রে পাবো ব'লে। জন্মজন্মান্তর ধ'রে জানবো তুমি হারাবার ধন নও। তোমার কাছ থেকে দূরে গিয়ে তোমারই মন্দির গড়বো এই প্রাণে, আমার যৌবন হবে অক্ষয়, এই রক্তকমলের পূজো দেবো নিত্যদিন, কারাগার হবে তীর্থ।—না, না, এখনই যেতে দেবো না, জ্যোৎস্না এখনও ফিকে হয় নি, পাখী এখনও ডেকে ওঠেনি।

আমি চুপ করিলাম। দুইজনের অশ্রুজল একত্র হইয়া মিশিতে লাগিল।

সুখের রাত্রি অতি ক্ষণস্থায়ী। দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমার চন্দ্র পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ হইয়া হেলিয়া পড়িতে লাগিল। দূরে কোথায় ইহারই মধ্যে নগর কীর্তনের দল বাহির হইয়াছে। ভোরের ট্রেণের বাঁশীটা শুনা গেল। এক আধটা সদ্যজাগা পাখীর অস্পষ্ট কণ্ঠ দূর হইতে ভাসিয়া আসিল। প্রভাতী বাতাস এক ঝলক আমাদের শয্যার উপর দিয়া হিল্লোল তুলিয়া গেল।

## ঘুমভাঙার রাত

সন্তোষের বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া উঠিলাম। সেও উঠিয়া পড়িল। কেবল একটা অদ্ভুত আচ্ছন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া এতক্ষণ কাটিয়া গেছে। সন্তোষ নিঃশব্দে জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কেহ তখনও জাগে নাই, পথে কোথাও লোক নাই। প্রাণীজগৎ তখনও নিদ্রায় অচেতন।

তাহার সহিত আমিও নিঃশব্দে নিচে নামিয়া আসিলাম। আর একটুও দেরি করা চলিবে না, পুলিশের দল সাধারণতঃ শেষ-রাত্রেই আসে। সন্তোষকে এখানে দেখিলে নূতন বিপত্তি ঘটিতে পারে।

দরজার নিকটে আসিলে আমি হেঁট হইয়া আমার জীবন-দেবতার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলাম। সন্তোষ আমাকে তুলিয়া শেষবার চুম্বন করিল। আমি তাহার বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিলাম, একটা অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে। রাণীদির সব ভার তুমি নেবে। তাঁর পায়ে যেন কুশাঙ্কুর না ফোটে।

সন্তোষ বলিল, কথা দিলুম।

আর একটা অনুরোধ। বলো রাখবে?

তোমার সব অনুরোধ রাখবো, যমুনা।

আমি কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, রাণীদিকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই। তুমি তাকে বিয়ে করবে।

সন্তোষ আমার হাত ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এর মানে কি, তুমি কি পাগল?

## ঘুমভাঙার রাত

বললাম, তিনি রাজি হবেন আমি জানি, তাঁর প্রতিজ্ঞা আছে আমার অনুরোধ পালনের।

এ তুমি কি বল্‌ছ যমুনা ?—সন্তোষ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

কাঁদিয়া বলিলাম, আমার সকল কিছু শূন্য হোক এই আমি চাই। তুমি সকলের চেয়ে আজ আমার প্রিয়, তোমাকে দান করব সেই হবে আমার সকলের বড় ত্যাগ। সেই গৌরব তুমি আমাকে দাও, সন্তোষ!—এই বলিয়া আমি বসিয়া পড়িয়া তাহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিলাম।

ভোরের বাতাস বহিতে লাগিল, নিশান্তের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার উপর দিয়া প্রভাতী আকাশে উদয়কালের রঙ ধরিতে লাগিল। সন্তোষ আমার মাথার উপর একবার ধীরে ধীরে হাত বুলাইল, তারপর গভীর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, তুমি আগে ফিরে এসো।—এই বলিয়া সে পা ছাড়াইয়া পথে নামিয়া গেল।

যতদূর দেখা গেল, উষাকালের অস্বচ্ছ আলোয় তাহার পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এক সময় গভীর অবসাদে আমার জাগরণক্লান্ত চোখে তন্দ্রা নামিল। সেইখানেই দেয়ালে মাথা হেলাইয়া বসিয়া রহিলাম এবং দেখিতে দেখিতে সর্বত্যাগিনী পথ-বাসিনীর চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

---

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা